॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ॥

॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট গল্পগুলিতে বিষয়বস্তুর অসাধারণ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যে তাঁর লেখক স্বভাবের ও পরিচয় নিহিত আছে। এই অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুযায়ী তাঁর গল্পগুলিকে সাজিয়ে বিষয়বস্তুর আলোকে তাদের বিশিষ্টতা নিরূপণ করা হবে।

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ
বীতংস	সমাজসমস্যামূলক
ষাঁড়	সমাজসমস্যামূলক
নীলা	সমাজসমস্যামূলক
প্রদীপ ও প্রজাপতি	সমাজ সমস্যামূলক
দুঃখ	সমাজসমস্যামূলক
নিশাচর	সমাজসমস্যামূলক
সৈনিক	সমাজসমস্যামূলক
ভাগাবন্দর	সমাজসমস্যামূলক
কবর	সমাজসমস্যামূলক
তীর্থযাত্রা	সমাজসমস্যামূলক
মনসামঙ্গী	ব্যঙ্গাত্মক
নূচির উপাখ্যান	সমাজসমস্যামূলক

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
পাণ্ডুলিপি	মনস্তাত্ত্বিক
আত্মহত্যা	মনস্তাত্ত্বিক
নষ্টচরিত	সমাজসমস্যামূলক
দুশাসন	সমাজসমস্যামূলক
কালোজন	সমাজসমস্যামূলক
পুষ্করা	সমাজসমস্যামূলক
অর্ধচশমা	মনস্তাত্ত্বিক
বনবিজ্ঞান	মনস্তাত্ত্বিক
খড়্গ	সমাজসমস্যামূলক
ঘুষি	সমাজসমস্যামূলক
ডিম	সমাজসমস্যামূলক
পাইপ	সমাজসমস্যামূলক
বনতুলসী	রোমান্টিক
জীবাণু	মনস্তাত্ত্বিক
চারতলা	আদর্শাত্মক , রাজনৈতিক
ডিনার	সমাজসমস্যামূলক
প্র্যাকটিস	সমাজসমস্যামূলক
ধন্বন্তরি	সমাজসমস্যামূলক
পিতরি	সমাজসমস্যামূলক
তরফদার	সমাজসমস্যামূলক

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
একটি শত্রুর কাহিনী	ব্যঙ্গাত্মক
ইতিহাস	ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক
বনজ্যোৎস্না	রোমান্টিক
হয়তো	রোমান্টিক
সেই মৃত্যুটা	সমাজসমস্যামূলক
দোসর	সমাজসমস্যামূলক
বিসর্জন	সমাজসমস্যামূলক
কালপুরুষ	রোমান্টিক
শৈব্যা	ব্যঙ্গাত্মক
টোপ	ব্যঙ্গাত্মক
ইজ্জৎ	সমাজসমস্যামূলক
অপঘাত	স্বদেশাত্মক, রাজনৈতিক
কন্দুক	সমাজসমস্যামূলক
শিল্পী	সমাজসমস্যামূলক
*শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু	সমাজসমস্যামূলক
উস্তাদ মেহের খাঁ	সমাজসমস্যামূলক
কনাবদর	মনস্তাত্ত্বিক
বাইশে শ্রাবণ	সমাজসমস্যামূলক
ঘর্ম	মনস্তাত্ত্বিক

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
তিমিরাভিসার	সমাজসমস্যামূলক
কলনেমি	ব্যঙ্গাত্মক
অধিকার	সমাজসমস্যামূলক
জন্মভূমিক	সমাজসমস্যামূলক
শ্বেতকমল	সমাজসমস্যামূলক
হাত	মনস্তাত্ত্বিক
ঘাসবন	রোমান্টিক
শিকল বাঁধা ভালুক	রোমান্টিক
কেয়া	সমাজসমস্যামূলক
মধুশর	সমাজসমস্যামূলক
উদ্বোধন	সমাজসমস্যা মূলক
উত্তরপুরুষ	মনস্তাত্ত্বিক
ধুনী	ব্যঙ্গাত্মক
তিনকাঁধা	মনস্তাত্ত্বিক
মহলা	রোমান্টিক
একটি চিঠি	মনস্তাত্ত্বিক
রেকর্ড	রাজনৈতিক, আদর্শাত্মক
তিতির	সমাজসমস্যামূলক
শুভক্ষণ	মনস্তাত্ত্বিক
ধুম	মনস্তাত্ত্বিক

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
কল্পপুরুষ	মনস্তাত্ত্বিক
তাস	মনস্তাত্ত্বিক
লজ্জা	মনস্তাত্ত্বিক
ইন্দুমিত্রের মোরগ	ব্যঙ্গাত্মক
হরিণের রক্ত	রোমান্টিক
শংখরাজ	সমাজসমস্যামূলক
উদ্যম	মনস্তাত্ত্বিক
দরজা	সমাজসমস্যামূলক
নতুনগান	আদর্শাত্মক, রাজনৈতিক
কলঙ্ক	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক।
হাঁস	রোমান্টিক
পুরোনো	স্নেহপ্রীতিমূলক
দণ্ডিত	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক
একটি অমর রাত্রি	সমাজসমীক্ষামূলক
প্রতিনায়ক	মনস্তাত্ত্বিক
দায়মোচন	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক
মর্যাদা	মনস্তাত্ত্বিক
কালোমোটর	মনস্তাত্ত্বিক

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
নেতার নাম	সমাজসমস্যামূলক
উর্বশী	রোমান্টিক
লালঘোড়া	রোমান্টিক
শেষচন্দ্রা	রোমান্টিক
তমস্বিনী	সমাজসমস্যামূলক
সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে	নারী পুরুষের যথাযথ সম্পর্ক ও প্রণয়াত্মক
কুয়াশা	মনস্তাত্ত্বিক
বদলে চিঠি	সমাজসমস্যামূলক
সেই পাখিটা	নারী পুরুষের যথাযথ সম্পর্ক ও প্রণয়াত্মক
একটি কৌতুকনাট্য	ব্যঙ্গাত্মক
সুখ	মনস্তাত্ত্বিক
ট্যাক্সিওয়ালা	মনস্তাত্ত্বিক
ঘূর্ণি	সমাজসমস্যামূলক
ধাত্রী	সমাজসমস্যামূলক
সীমান্ত	সমাজসমস্যামূলক
ঘৃণা	রোমান্টিক
দিগন্ত	মনস্তাত্ত্বিক

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
সোনালী বাঘ	ব্যঙ্গাত্মক
চক্রব্যূহ	সমাজসমস্যামূলক
বারো সরিকের দিন	সমাজসমস্যামূলক
বীরভোগ্যা	ব্যঙ্গাত্মক
মৃত্যুবাণ	সমাজসমস্যামূলক
অনুধনিকার শেষ খুন	সমাজসমস্যামূলক
অবাদ	সমাজসমস্যামূলক
সপ্তপদী	রোমান্টিক
বৃষ্টি	রোমান্টিক
মারীচ	ব্যঙ্গাত্মক
জরতী	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রশ্নাত্মক
জান্তব	মনস্তাত্ত্বিক
দুর্ঘটনা	মনস্তাত্ত্বিক
ফলশ্রুতি	মনস্তাত্ত্বিক
জন্মান্তর	সমাজসমস্যামূলক
বৃত্ত	সমাজসমস্যামূলক
দুর্লঙ্ঘ্য	স্নেহপ্রীতিমূলক
বিভীষণ	সমাজসমস্যামূলক

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
কানাই	সমাজসমস্যামূলক
ব্যাধি	সমাজসমস্যামূলক
একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা	ব্যঙ্গাত্মক
দর্পণ	নারী ও পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক
বাইচ	সমাজসমস্যামূলক
গোখরো	মনস্তাত্ত্বিক
প্রপাত	সমাজসমস্যামূলক
রায়মঙ্গি ওঘাটে (এবং আজিজুল)	সমাজসমস্যামূলক
অনেকবেশী আকাশ	রোমান্টিক
দেনা	মনস্তাত্ত্বিক
অভিনয়	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক
স্রোত	সমাজসমস্যামূলক
পলায়ন	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক
ইন্টারভিউ	সমাজসমস্যামূলক
থার্মাদের এক রাত	সমাজসমস্যামূলক
বঙ্গবিলাস সংবাদ	সমাজসমস্যামূলক
জটিয়ানী	দুঃখপ্রীতিমূলক
ছায়াসঙ্গিনী	মনস্তাত্ত্বিক
নীলকণ্ঠ	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
অন্ত্যেষ্টি	সমাজসমস্যামূলক
বাড়িবদল	সমাজসমস্যামূলক
জননী	সমাজসমস্যামূলক
পঞ্চশরনিবাস	রোমান্টিক
মত	মনস্তাত্ত্বিক
ক্ষাত	মনস্তাত্ত্বিক
খাঁচা	প্রতীকধর্মী
নকল	প্রতীকধর্মী
শিষ	প্রতীকধর্মী
চায়ের বিকেল	প্রতীকধর্মী
ব্লেড	প্রতীকধর্মী
পদধ্বনি	প্রতীকধর্মী
অনুকম্প	প্রতীকধর্মী
চাবি	প্রতীকধর্মী
সূর্য আসবে	প্রতীকধর্মী
প্রহরী	সমাজসমস্যামূলক
স্বখাত	নারীপুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রত্যাত্মক
ধুনী	সমাজসমস্যামূলক
আকাশ	প্রতীকধর্মী

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
টেস্টটিউব	প্রতীকধর্মী
সাপের মাথার মণি	প্রতীকধর্মী
প্রতিপক্ষ	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রণয়াত্মক
মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু	সমাজসমস্যামূলক
কাণ্ডারী	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রণয়াত্মক
একজিবিশন	রোমান্টিক
অমনোনীতা	মনস্তাত্ত্বিক
মিনতি	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রণয়াত্মক
অভিধা	সমাজসমস্যামূলক
মধুবন্তী	রোমান্টিক
দাম	স্নেহপ্রীতিমূলক
রাণীরহস্য	সমাজসমস্যামূলক
গলি	মনস্তাত্ত্বিক
দ্বিতীয় শরীর	মনস্তাত্ত্বিক
আমার মার গলা	স্নেহপ্রীতিমূলক
রাঙা মাসিমা	স্নেহপ্রীতিমূলক
সমবেদনা	স্নেহপ্রীতিমূলক
চতুষ্কোণ	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রণয়াত্মক

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
আমার কথা	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক
কাদা	নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক
রাজপুত্র	রোমান্টিক
এক জঙ্গল থেকে	সমাজসমস্যামূলক
আস্তোদিতে	রোমান্টিক
মুকুন্দর পাত্রী	সমাজসমস্যামূলক
মর্যাদা (অষ্টাদশী)	স্নেহপ্রীতিমূলক
কে সে লোকটা	সমাজসমস্যামূলক
অকস্তুল	নারী পুরুষের অবৈধগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক
দোলন চাপার বৃত্ত	সমাজসমস্যামূলক
ক্যারিকেচার	সমাজসমস্যামূলক
মিছিলের মধ্যে	সমাজসমস্যামূলক
মুকুর	সমাজসমস্যামূলক
ছোরা	মনস্তাত্ত্বিক
কিউজ	মনস্তাত্ত্বিক
অকলঙ্ক	রোমান্টিক
সিম্ফিনাড	রোমান্টিক
মদনভস্ম	রোমান্টিক

গল্পের নাম	বিষয়বস্তু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ
নস্যির খাঁ	সমাজসমস্যামূলক
দূত	সমাজসমস্যামূলক
কমিশন	সমাজসমস্যামূলক
যাচাই	সমাজসমস্যামূলক
গাছের সারি	সমাজসমস্যামূলক
মোহিনের কথা	সমাজসমস্যামূলক
মাধ্যাকর্ষণ	রোমান্টিক
আরো একজন	সমাজসমস্যামূলক
টুটুল	স্নেহপ্রীতিমূলক
আর্মান সোনের লোকটা	স্নেহপ্রীতিমূলক
আলেয়ার রাত	রোমান্টিক

ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজসচেতন লেখক। বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিকের লেখা ছোটগল্পে এই সমাজসচেতনতাই বারে বারে ধরা পড়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে যখন আত্মপ্রকাশ করেন তখন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাংলাদেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। খাদ্যসংকট, বস্ত্রসংকটের ভয়াবহতায় একদিকে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষগুলির চরম অসহায় অবস্থা, অন্যদিকে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী মানুষের অবৈধ উপায়ে সম্পদ কুক্ষিগত করার লিপ্সা, চোরাকারবার, পেকুলেশন, খাদ্যে ভেজাল

এমনকি গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের ভুলিয়েভালিয়ে শহরের পতিতাপল্লীতে বিক্রি করে দেবার মতো দুঃখজনক ঘটনা বাংলাদেশের সমাজজীবনে দুঃসহ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল । এই বিশেষ পটভূমি থেকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের মালমশলা সংগ্রহ করেছেন । ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ছোট গল্পে সমাজসমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে ।

'বীতংস' গল্পে ভন্ড , প্রেত , মন্ত্র তন্ত্র ঝাড় ফুঁক শিকড় বাকড়ের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে অভ্যস্ত সাঁওতালদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত স্বাভাবিকগতিতেই এগিয়ে যাচ্ছিল , কিন্তু তাদের জীবনের এই সহজ চলার ছন্দ সাধুবেশী সুন্দরলালের আবির্ভাব ছিল তাদের কাছে অভিশাপ । অত্যন্ত সরলবিশ্বাসেই তারা সুন্দরলালের প্রতারণার শিকার হয়েছিল । শিঙবোঙা , করমদেবতার প্রতিও ছিল তাদের অন্ধবিশ্বাস । কাজেই আসামের চা বাগানের জন্যে কুলী সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত সুন্দরলালের দৈববাণীকে তারা বিশ্বাস করেছিল । এই কারণেই পাহাড় থেকে হরিণের পাল এসে গম খেয়ে গেলে তারা প্রতিকার খোঁজে সুন্দরলালের কাছে , বড়কা সাঁওতাল এক সাঁওতাল মেয়ের কপালে সিঁদুর লেপে দিয়েছে , কিন্তু সমাজের নিয়মে তার বিয়ে হয় না কেন – তিন মাস ধরে কারো পায়ের ঘা সারছে না – কেউ তার অনিষ্ট করেছে কিনা – এসব কিছুর জন্যে সুন্দরলালের কাছেই তারা ছুটে আসত । সুন্দরলাল এই দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তার উপর শিঙবোঙার ভর হয়েছে ভাব দেখিয়ে সাঁওতালদের বিধান দেয় – করমদেবতার কোপ থেকে বাঁচতে হলে তাঁকে অনুসরণ করতে । ঝড়ু সর্দারের মেয়ে বুধনীও সুন্দরলালের প্রলোভনের শিকার হয়েছিল । এই সুযোগে সুন্দরলাল উদ্দেশ্যসিদ্ধ করে সাঁওতালদের নিয়ে যায় আসামের চা বাগানের দিকে , সঙ্গে বুধনীকেও । 'বীতংস' গল্পে সাঁওতালদের সহজ সরল সমাজজীবনে , শঠ , প্রতারক সুন্দরলালের আবির্ভাব অভিশাপের মত কাজ করেছে । সাঁওতাল সমাজের সুখকর

জীবনের ছন্দ যে দৈব বিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কার ছিল বদ্ধমূল, সেইটিকে কাজে লাগিয়ে সাধুবেশী সুন্দরলাল তার কাজ হাসিল করেছে। সমাজসমস্যামূলক গল্প হিসাবে এই গল্পটি তাই অত্যন্ত মূল্যবান।

'হাড়' গল্পের সামাজিক চিত্র বড়ই নির্মম। রায় বাহাদুর এইচ এন চ্যাটার্জীর প্রাসাদ, গেটের করাল দর্শন কুকুর, বাগানে গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার উগ্র মধুর সুরভি, অ্যাসফল্টের প্রশস্ত রাস্তা, মার্বেল পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি, রঙীন কাঁচের জানালায় সিল্কের পর্দা, চীনেমাটির টবে কম্পমান অর্কিড আভিজাত্যগর্বিত সমাজজীবনের প্রতীক। অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের দিনে মনোহরপুকুর পার্কে বুভুক্ষু মানুষের আর্ত কণ্ঠস্বর, ডাস্টবিনে কুকুরে মানুষে খাদ্যসংগ্রহের প্রতিযোগিতা ও কাঠির মতো হাত পা ওয়ালা শিশুর হাড় চুষে খাওয়ার দৃশ্য বড়ই করুণ। অথচ আভিজাত্যগর্বিত সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ রায়বাহাদুরের মতো মানুষের কাছে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের এই দুর্দশাগ্রস্তজীবন ঘৃণ্য। তাই হাওয়াইয়ের হুলাহুলা ড্যান্স, স্টিভেনসন, ব্যালেন্টাইনের প্রবালদ্বীপের দেশ, ফিলিপাইনের যাদুবিদ্যা আর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সংগ্রহ করে আনা রোডেশিয়ানের স্বজাতীয় অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক গরিলার হাড়, ও তাহিতির দ্বীপে বলি দেওয়া কুমারী মেয়ের হাড়ের গল্প তাঁর মুখ থেকে শোনা গেলেও দুর্ভিক্ষের দিনে তা বড়ই বেমানান।

'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' গল্পের সামাজিক আবেদন মর্মস্পর্শী। রঙিন স্বপ্ন আর সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার আশা একটি মেধাবী ছাত্রের জীবনে কিভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই গল্পটি। এই সমাজ-জীবনে যে ছাত্রের হাতের ছোঁয়ায় একদিন সাঁওতাল পরগনায় বাঁধ ঢালনো খ্যাপা পাহাড়ী নদী বিশাল ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে থমকে দাঁড়াতে পারত, যে সুইচ টিপলে - হাইড্রো - ইলেকট্রিকের হাজার হাজার আলোয় ঝলমল করে উঠতে পারত

বিষয় - পশ্চিমবাংলার সেরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট, ব্লাস্ট ফার্নেসের রক্তিম আভায় যে ছাত্র শক্তি ইস্পাতে নতুন ভারতবর্ষের ভিত্তি রচনা করে দিতে পারত, সমাজের নির্মম ব্যবহারে তার কাছে সব সম্ভাবনাই রুদ্ধ হয়ে যায়। বাবার মৃত্যুর পর কাকার চেষ্টায় হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে স্কলারশিপ নিয়ে সে পাশ করেছিল। কিন্তু বড় শহরের হাইস্কুলে পড়বার সময় ফ্রী পেয়েও শেষ পর্যন্ত ধানচালের আড়তদার সামন্তদের বাড়িতে খাতা লিখে ও হিসেব কষে দেবার পরিবর্তে তারথাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। গরীব চাষীর ছেলে বলে দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা থাকা সত্ত্বেও সে আত্মীয়তা তারা স্বীকার করেনি। কিন্তু একটু সুযোগ পেলে, একটু সহানুভূতি পেলে যে ছাত্রটির ভালো ফল করার কথা, বইপত্রের অভাবে সামন্তদের খাতা লেখার চাপে সে পাশ করে থার্ড ডিভিশনে। কলেজে ভর্তি হতে গিয়েও গরীবের ছেলে বলে প্রিন্সিপাল ভেবেছিলেন - হায়ার এডুকেশন তাদের জন্যে নয়। শেষপর্যন্ত কলকাতায় সামন্তদের আত্মীয় বড়বাজারের সরকারদের তামাকের দোকানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আশ্রয় পেয়ে রাতজেগে সরকার কর্তার খাতা লিখে স্টুডেন্টস এইড্ ফাণ্ড ও সরকার কর্তার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সে পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু বইপত্র আর পড়াশুনার সুযোগের অভাবে সে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছে যে পরীক্ষায় সে পাশ করতে পারবে না। ঐ পরীক্ষক মহাশয়ের কাছে সে চিঠি লিখে তার জীবনের ভয়াবহ ব্যর্থতার কারণ জানিয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার চিঠিতে সমাজের অবহেলিত মেধাবী ছাত্রদের ব্যর্থতার বাণীকেই সে শুনিয়েছে। চিঠির মধ্য দিয়ে এই গল্পে দারিদ্র্যপীড়িত ছাত্র সমাজের হৃদয়ের কান্নাই যেন প্রকাশ পেয়েছে।

'পুষ্করা' গল্পটিতে একদিকে যেমন দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের কলেরার মড়ক কবলিত গ্রামের মানুষের অসহায়তার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি আছে সংস্কারান্ধ বাংলার গ্রামের মানুষকে ফাঁকি দিয়ে দুর্ভিক্ষের দিনে ধানচালের কারবার করে এক শ্রেণীর মানুষের সুযোগ বুঝে টাকা উপার্জনের চিত্র। বাংলাদেশের মোহিপুর গ্রামের শিশু, বৃদ্ধ সব কলেরার মড়কে আক্রান্ত হয়ে, যখন গ্রামকে

গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়েছিল তখন শূকরের হাত থেকে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে শহর থেকে তিনশো টাকা কন্ট্রাক্টে ঠাকুরকে দিয়ে মহাজন বনাই ঘোষ শুক্লচতুর্দশীর রাতে শ্মশানকালীর পূজা করিয়ে শিবা ভোগ দিয়েছেন। কিন্তু শ্মশানকালী নয়, ডোম পাড়ার বুড়ুমু পাগলীটা সেই ভোগ এসে খেয়ে যায়। তালুকদার মহাজনের শোষণে পীড়িত বাংলার মড়ক আর মন্বন্তর বিধ্বস্ত সংস্কারান্ধ দুর্বল মানুষকে এইভাবে সন্তুষ্ট রেখে এই শ্রেণীর মানুষগুলি সেদিনের মানবতার চরম অপমান করেছে। সমাজ সচেতন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শূকরা' গল্পে সংস্কারান্ধ মৃত্যুমুখী মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ঠাকুরের এই সাজানো শিবাভোগের আয়োজন তাই সম্পূর্ণই হাস্যকর।

'নীলা' গল্পে বাংলাদেশের সীতাগঞ্জ অঞ্চলের আঁখ চাষীদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুগার মিল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চাষীদের গুড় তৈরীর কারখানাই কেবল বন্ধ হয়ে যায়নি, গ্রাম থেকে যারা মিলে আঁখ নিয়ে আসত গাড়ির ওজন বাদ দিয়ে তাদের টাকা দেবার পরিবর্তে আখের অর্ধেক ওজন বাদ দিয়ে আঁখচাষীদের ওপর বড়ই অবিচার করা হত। আঁখচাষীরা এজন্য আন্দোলন করলে শক্তি সান্যাল তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্যে ছাঁটাই হয়েছিল। পরে অবশ্য ম্যানেজার ভাস্কর নটরাজনের পার্সোনাল সেক্রেটারী নীলা কৌশলে শক্তি সান্যালকে কাজে বহাল করার অনুমতি ম্যানেজারেরকাছ থেকে আদায় করে নেন। এ গল্পে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনযাত্রায় যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তারই পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। ট্যাগোরের রেড অলিন্ডার্স, গার্ডেনার, নাভর্স শিফ্ট আর গীতাঞ্জলি পড়ে সুগার মিলের ম্যানেজার ভাস্কর নটরাজন কুন্তলার সাথে গ্রামের পথে বেরিয়ে ভেবেছিল, অঞ্জনা নদীর ধারে খঞ্জনা গ্রামের প্রান্তে খুঁজে ফিরবে কোন এক রঞ্জনাকে, সবুজ ধানের খেতে খুঁজে পাবে কৃষ্ণকলির কালো হরিণ চোখ। কিন্তু ভাস্কর সেদিন যে গ্রাম দেখেছে সে গ্রামে ছড়িয়েছিল দুঃসহ দারিদ্র্য। পচা, ডোবা, জঙ্গলে ঘেরা বাংলার গ্রামে হাড়বের করা বলদ, ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আর দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের অসহায় জীবনযাত্রা বাংলার সমাজ-

জীবনের করুণ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছে এই গল্পে। তাই নীলা সমাজসমস্যা-মূলক গল্প।

'দু:শাসন' গল্পে দুর্ভিক্ষের প্রভাবে নিদারুণ খাদ্যাভাবের সাথে ভয়াবহ বস্ত্র সংকট মিলিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষের বড়ই অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রী - কন্যার লজ্জা নিবারনের সামান্য পরিধেয় বস্ত্রটুকু সংগ্রহের ক্ষমতা সাধারণ মানুষের ছিল না। অথচ এই সমাজেই এমন কিছু মানুষ আছেন যারা কৃত্রিম বস্ত্র সংকট তৈরী করে অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি। মহাভারতের কাহিনীতে দু:শাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করেছিল আর এযুগে ভয়াবহ বস্ত্র সংকটের দিনে কাপড়ের ব্যবসায়ী দেবীদাস বাংলার মেয়েদের বস্ত্রহরণ করে নিয়েছে। একজোড়া কাপড়ের জন্যে চোখের জল ফেলে পা জড়িয়ে থেকেও তার কাছে কোন লাভ নেই। অথচ থানার দারোগা শচীকান্তবাবু যাত্রার আসরের জন্যে কনেস্টবল কানাইকে পাঠালে সেই দেবীদাসই পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করে। এ গল্পে থানায় যাত্রার আসরে সমবেত অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন, জীর্ণ-শীর্ণ গ্রামের মানুষ এসেছিল দর্শক হয়ে। তাদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজজীবনের দুরবস্থার নিখুঁত রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া দু:শাসনের রক্ত পান পালা যেন বাংলাদেশকে পৌঁছে দিয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দিনে।" সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে।" ৪১ মুচিপাড়ায় এই দুর্ভিক্ষের বস্ত্র সংকটের চিত্র আরো বীভৎস আরো ভয়াবহ। সেখানে সদ্যজন্মপ্রাপ্ত শিশুকে মায়ের কাছ থেকে শেয়ালে টেনে নিয়ে যায় এবং ভোরবেলায় নদীর ঘাটে ষোড়শী কিশোরী মেয়েকে বিবস্ত্রা অবস্থায় জলমগ্ন করে নিয়ে যেতে হয়।

---

৪১ • নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -২(গল্প - দু:শাসন), মাঘ, ১৩৮৮, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা -৪৪৩

''যুদ্ধের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাস মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।''[৫০] এ যুগের দুঃশাসন দেবীদাসের মতো বস্ত্রব্যবসায়ীরাই এজন্য দায়ী। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দুঃশাসন রক্ত দিয়েছিল তার কৃত অপরাধের শাস্তির জন্যে, এযুগে দেবী দাসকেও তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাই যাত্রার আসর থেকে ফেরার পথে কৃষকের ধারালো হেঁসোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠলে দেবীদাস তাদের ঝকঝকে শান দেওয়া সেই হেঁসোর দিকে তাকিয়ে ভয় পায়।

'ইজ্জৎ' গল্পে সামাজিক সমস্যা হিসেবে এসেছে হিন্দু মুসলমানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিবেশ। কিন্তু গল্পের প্রকৃত সমস্যা দাঙ্গা নয়, দুর্ভিক্ষের দিনে বস্ত্রসঙ্কটের ভয়াবহতাই এ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। ফকিরের সমাধি আর ডাকাতে কালীর থানের সহাবস্থানে গ্রামে বহুকাল থেকেই হিন্দু মুসলমানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু মৌলবীসাহেব যেদিন গ্রামের মাদ্রাসায় এসে 'ওয়াজ' করলেন, সেদিন থেকেই মুসলমান পাড়ার খলাফতাই আর নমশূদ্র পাড়ার জগন্নাথ ঠাকুর দুজনের নেতৃত্বে হিন্দু - মুসলমানের বিরোধ চরমে ওঠে এবং সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়। কিন্তু দুই নেতাই কাপড়ের অভাবে বাড়িতে বড়ই অসহায়। খলাফতাই ঘরের জরু বিটির ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারে না, জগন্নাথ ঠাকুরের বউ কাপড়ের অভাবে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চেয়েছে। গ্রামের বড়লোক, ইউনিয়নবোর্ডের মেম্বার ও ফুডকমিটির সভাপতি হাবিব মিঞার গুদামে কাপড় মজুত থাকলেও সে কাপড় খলাফতাই এবং জগনাথ কেউই পেতে পারে না। অথচ হাবিব মিঞার নানিবিবির মৃত্যুর পর চমৎকার রঙীন শাড়ি আর ধবধবে কাপড়ে কাফন করা হয়। খলাফতাই ও জগন্নাথ ঠাকুর দুজনে রাতের অন্ধকারে কবর খুঁড়ে কাপড় সংগ্রহ করতে থাকে। বস্ত্র সঙ্কটের এই চরম দিনে ফকিরের

---

৫০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -২, (গল্প -দুঃশাসন), মাঘ, ১৩৮৮, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৪৪০

সমাধি আর তালাতে কালীর থান নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে তা এই ভাবেই মিটে যায়।

'তীর্থযাত্রা' গল্পেও আছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার বীভৎস রূপ। ১৩৫০ সালের আশ্বিন মাসে বাংলার আকাশে যখন যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়েছে ঠিক তখনই এসেছে দুর্ভিক্ষ, সর্বগ্রাসী। চণ্ডীমণ্ডপে পুজো ছিলনা, সাপ আর শেয়াল এসে বাসা বেঁধেছিল ; বোধনতলায় ছড়িয়েছিল নরমুণ্ড।" বাংলার ঘরে ঘরে যখন প্রদীপের শিখা নিবে গেছে, ছায়াকুঞ্জের নিচে সোনার পল্লীতে কল্যাণীবধূর কাঁকন আজ আর ছল ছলে বেজে উঠছে না। ব্ল্যাক আউটের দিনেও নিবে যাওয়া তুলসী-তলারপ্রদীপ সহস্র ছটায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহানগরীর গণিকাপল্লীতে।''[৫১] এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের তেরো থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মেয়েদের কালীঘাট তীর্থদর্শনে নিয়ে যাওয়ার নাম করে অর্থ পিশাচ নরোত্তম ঠাকুর নৌকো করে বিক্রয়ের জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নৌকোর ফরিদ মাঝির হাতে সে তার কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

'আবাদ' গল্পে দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, হিন্দু মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। বরিশাল জেলার পটুয়াখালি মহকুমার চাষী পরাণ মণ্ডলের ঘটনা বহুল জীবনের মধ্য দিয়ে এ গল্পের সামাজিক সম্ম পরিবেশটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জমিদার শাসিত বাংলাদেশের বরিশাল জেলার শায়েস্তাবাদের খাতের জলে যখন ঘর জমি সব ভেসে যায় তখন লাঙল কাঁধে নিয়ে দৈত্যের মতো মানুষ পরাণ মণ্ডল ও তার ভাই জুড়ান মণ্ডল চলে আসে বাংলাদেশেরই পটুয়াখালি মহকুমায়। সেখানে মুখুজ্জে বাড়ির মেজ কর্তার দয়ায় বাঘ, কুমীর সাপে ভরা তারাবনের জঙ্গল নিকাশ করে নতুন জমি তৈরী করে

---

৫১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী -২ (গল্প -তীর্থযাত্রা), মাঘ ১৩৮৮, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ৩৭৬

তারা আবাদ করেছিল নতুন ফসল । দশ বছরের মধ্যে কুড়ি ঘর পেরতে ভরে যায় পলাশ ডাঙার তারাবন । যুদ্ধ মন্বন্তরে সারা দেশের মানুষ বিপন্ন হলেও তারাবনের চাষীরা গায়ের জোরে শক্ত হাতে লাঙল ধরে পেরিয়ে গেছে মন্বন্তর । কিন্তু স্বাধীনতা, দেশবিভাগই ডেকে আনল তাদের জীবনে চরম বিপর্যয় । জমিদার মেজকর্তা পর্যন্ত চৌদ্দপুরুষের শিকড় ছিঁড়ে চলে এলেন কলকাতায় । তারা বন কেটে যে ক্ষেত করেছিল পরাণ ও জুড়ান, আবাদ করেছিল সোনার দানা, সেই মাটি, সেই ধান, সেই গাছ সব পর হয়ে গেল । শুধু মুখুজ্জে বাড়িতেই তার প্রভাব পড়েনি, সারা গ্রাম ফাঁকা হয়ে গেল । ঘরে ঘরে নিবে গেল সন্ধ্যা প্রদীপ, গাঙের ওপারে গাজীর পীরে জ্বলল মশাল । উঠল লাঠি খেলার আওয়াজ । হিন্দু মুসলমানে বাঁধে দাঙ্গা কলকাতায়, ঢাকায় । তারা বনেও তার ঢেউ এসে লাগে । মনে দায়ের কোপে জুড়ানের প্রাণ গেল । জুড়ানের বউ আর পরানের মেয়ে হল নিরুদ্দেশ । গাঙের জলে নাজির ঘায়ে পরাণের দুই ছেলে মরে গেল, পুড়ে গেল ঘর বাড়ি । নিরাশায় ভবিষ্যৎ নিয়ে আট মাসের ছেলে আর বউকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে কলকাতার উদ্বাস্তু শিবিরে এসে আশ্রয় নেয় পরাণ । তারপর সেখান থেকে আসে আরেক ক্যাম্পে । জমি বিলি করা হবে, পরাণ আবার জমি গড়বে, করবে নতুন আবাদ । কিন্তু পাশের চালার রাজেন দাসের মেয়েকে রাতের অন্ধকারে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় পরাণের শরীরে দেখা দেয় কুড়ি বছর আগের সেই শক্তি । উত্তেজিত পরাণ ছদ্মবেশী বাঙালী অপরাধীদের পেছনে ছুটে গিয়ে কোদালের ঘায়ে দুজনকে খুন করে । পরাণ মণ্ডলকে প্রতীক করে তার ঘটনাবহুল জীবনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের চিত্রটি গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক । তাঁর সমাজ সচেতনতার পরিচয় আছে এই গল্পে ।

জোতদার, মহাজন সম্প্রদায়ের শোষণ থেকে মুক্তির জন্যে চাষীদের ভাগচাষ আন্দোলন ও জোতদার মহাজনের হৃদয়হীন আচরণের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে 'কন্দুক' গল্পে । যুগ পাল্টে যাচ্ছে, দেশে স্বাধীনতা আসছে । তাই

গরীব চাষীরা তাদের দুঃখ দূর করে অন্নের সংস্থানের জন্যে জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে যে ফসল তারা ফলায় সে ফসল কাটার অধিকার তাদেরই। এই সহজ সত্যটি তারা জোতদারদের বুঝিয়ে দিতে চায়। জোতদারকে ওরা ফসলের এক ভাগ দিতে রাজি। জোতদার লোকনাথ সাহা, সজনআলি, নূর মামুদ ও বৃন্দাবন পাল তাদের বুঝিয়েও নিরস্ত করতে পারেনি। তাই চাষীদের নেতা রহমানকে রঘুরাম তাড়িওয়ালাকে দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রঘুরাম কৌশলে ওদের চারজনের কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে এসে তুলে দিয়েছে রহমানেরই হাতে।

'নেতার জন্ম' গল্পে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এস.ডি.এফ.আর.সি.এস. জগদীশ্বর ব্যাটবল 'সার্ভ অ্যান্ড সেভ ইয়োর কান্ট্রি' এই আদর্শ নিয়ে কাজ শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত আদর্শ বিচ্যুত হয়েছেন। তাই মেদিনীপুরের গ্রামের দরিদ্র-মুমূর্ষু বিধবার সন্তানকে ডেলিভারী করানোর জন্য চেষ্টা নিয়েও শেষ পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত জনতার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে তিনি কৌশলে শিশুটিকে হত্যা করেন। অন্যদিকে টাকার লোভে বড়লোক রামদাসবাবুর স্ত্রীর ডেলিভারীর জন্য ছুটে যান। অথচ দরিদ্রমায়ের যে ছেলেটি পৃথিবীর মুখ দর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল, বেঁচে থাকলে তাঁর পাঁচ হাত লম্বা শরীর ও লোহার মত প্রশস্ত বুক নিয়ে সেই হত ভিলেজ আন্দোলনের নেতা। পরিবর্তে রামদাসবাবুর চামচিকের মতো রুগ্ন ছেলে একদিন হবে বড় নেতা, লক্ষ নরমুণ্ডের সিংহাসনে হবে তার অধিষ্ঠান। জগদীশ্বর ব্যাটবলের আদর্শ প্রবণতা থেকে আদর্শ বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে এ গল্পের সামাজিক সত্যটি পরিস্কার ফুটে উঠেছে।

'বারো সরিক্কের বিল' গল্পে সংস্কারান্ধ গোয়ালাদের জীবনের চিত্রটি ধরা পড়েছে। একদিন বারো সরিক্কের বিল ওদের জীবনে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল। ভরা বিল বাতাসে ঢেউ তুলত, রাশি রাশি জল চারিদিকে খেলা করত, জলের কোল ঘেষে জন্মাত সবুজ ঘাস। সেই ঘাসে চড়ে বেড়াত অসংখ্য গরু, মোষ। দশ সের, পনেরো সের আধ মন পর্যন্ত দুধ হত তাদের। স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিতে

ভরে যেত বারো মল্লিকের বিলের গোয়ালাদের জীবন। কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বছর পর বিল হয়েছে নির্দয়। শাওলা পানা আবর্জনার স্তূপে ভরে ওঠে বিল। বিবর্ণরক্তশূন্য মাঠের জমিতে যে গরুগুলি চড়ে বেড়াত শুকিয়ে তাদের হাড় বেরিয়ে গেল, দুধ কমে দাঁড়াল এক সের, দু'সের। বারো মল্লিকের বিলের মালিক বাহাত্তর মল্লিকে পরিণত। কিন্তু তাদের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয় কারণ অমিত স্বাস্থ্য অপরিমেয় জীবন দানের পরিবর্তে বিল হয়েছিল মৃত্যুবাণ। পাশাপাশি এল ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মহামারী আর মহাজনী শোষণ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন প্রেরণা বারো মল্লিকের বিলের ঘোষদের নেই। ওই রাম হরি ঘোষের ছেলে নীলমাধব যখন এসে পরামর্শ দিয়ে বলে বিলে বাঁধ দিয়ে ধান ছড়িয়ে দিতে তখন গঙ্গাধর ঘোষ নীলমাধবকে সন্দেহ করে। গঙ্গাধরের ঘরে অসুস্থ ছেলে সুস্থ হয়ে ভাতের জন্য কাঁদে, গঙ্গাধর নির্দয় চিত্ত তা সয়ে যায়। কিন্তু তার একমাত্র ভরসা রাঙি গাইটা মরেগেলে গঙ্গাধর সেটাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে বিলের দিকে। পথে বিপন্ন গঙ্গাধরকে অসহায় অবস্থায় একটু সাহায্য করবার জন্যে ফকির ঘোষ তার সংগৃহীত দু'সের ধান থেকে এক সের তাকে দিয়ে দেয়। গঙ্গাধর সেই ধান কোমরে বেঁধে মৃত গরুটা টেনে নিয়ে যেতে যেতে মাথা ঘুরে বিলের জলে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। অনেক দিন বাদে গঙ্গাধরের মৃত দেহের স্থানটিতে নরম কাদার মধ্যে দেখা গেল একগুচ্ছ ধানের শীষ। গঙ্গাধরের মৃত্যু হল মর্মান্তিক ভাবে কিন্তু তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারো মল্লিকের বিলের মালিক বাহাত্তর মল্লিকের মন থেকে বদ্ধমূল সংস্কার মুছে যায়। গঙ্গাধর বেঁচে থেকে যা পারেনি তার মৃত্যুর পর বারো মল্লিকের উত্তরাধিকারী বাহাত্তর মল্লিক অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি খুঁজে নিতে বাহান্ন গোয়ালাদের হাতে বিলের মাটিতে সোনা ফলানোর সম্ভাবনা সার্থক করেতোলে। সমাজসমস্যামূলক গল্প হিসেবে এ গল্পের মূল্য অসীম।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এইসব গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্লোকের গোপন কামনাকে

আশ্চর্য বিশ্লেষণী শক্তিতে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু তাঁর গল্পে কোথাও মানব মনের অতল খাদে তিনি অবতরণ করেননি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহজ স্বাভাবিক মানসিক বিকারগুলিকে, নরনারীর মানসিক দ্বন্দ্বকে তিনি ফ্রয়েড নির্দেশিত পথে বিশ্লেষণ করেননি। এই কারণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশগুপ্ত কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো মনোসমীক্ষার গহন গভীরে তিনি প্রবেশ করেননি। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্য বলেছেন, " বিগত যুগে ফ্রয়েড প্রদর্শিত মনঃসমীক্ষণের পন্থায় সাহিত্যে জীবন রহস্য উদ্ঘাটনের রীতি অতি প্রয়োগে যেন নিজেকে নিঃশেষিত করেছে। তাছাড়া চেতন - অবচেতনের চিরন্তন সঙ্ঘাতের অতলান্ত গভীরতায় ব্যক্তি জীবনের আনন্দ বেদনার উৎস সন্ধানের ফলে শিল্পলোকের এক রহস্য - মহলের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছে বটে, কিন্তু মার্ক্সীয় জীবনবেদ এ যুগের দৃষ্টিকেই যে একেবারে বদলে দিয়ে গেছে। এযুগের দৃষ্টিব্যক্তি - কেন্দ্রিকতার গণ্ডী অতিক্রম করে সমষ্টি জীবনের বিপুল স্পন্দনের ক্ষেত্রে প্রসারিত। এ যুগের শিল্পেও ব্যক্তিনিষ্ঠ মনস্তত্ত্বের স্থান দখল করেছে এক অভিনব মানসলীলাতার নাম দেওয়া যেতে পারে'সমাজতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ব'। এ যুগের শিল্পী তাই মনের মধ্যে তলিয়ে গিয়েও অন্তর্মুখী নয়, বহির্মুখী। যে সমাজ চৈতন্যে যুগজীবন আন্দোলিত, ব্যক্তি মনের গভীরেও তারই প্রতিফলন।" [৫২] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু কিছু ছোটগল্পকে তাই মনস্তাত্ত্বিক শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প আলোচনা করে এই মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণ কতটা প্রতিফলিত তা আলোচনা করা গেল।

'কুয়াশা' গল্পে প্রৌঢ় রায় চৌধুরীর সাথে মঞ্জু নামে যুবতী মেয়েটির অবৈধ সম্পর্ক ছিল। বাড়ি ঘরে বসে সুবিধে হয়নি বলে ভদ্রলোক পাহাড়ে এসেছিলেন মেয়েটিকে নিয়ে ফূর্তি করতে। কিন্তু সেখানে বত্রিশ নম্বর বাংলোয় রাত কাটাতে গিয়ে মদের নেশায় ভদ্রলোক মনে করেছিলেন মেয়েটি বুঝি তাঁর

- -

৫২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প : অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য রচিত ভূমিকা : পৌষ ১৩৬৩, সপ্তম মুদ্রণ, প্রকাশ ভবন, পৃষ্ঠা - ১৬

তাঁকে তেমন ভালো বাসে না। ভদ্রলোক নেশার ঝোঁকে গোবিন্দলালের পার্ট করতে যাচ্ছিলেন, মঞ্জু তাতে বাধা দেয়। ফলে ভদ্রলোকের পায়ে বন্দুকের গুলি লেগে যায়। কিন্তু অহমিনিয়ারী হাসপাতালের ডাক্তার অমূল্য দত্ত গুপ্ত তাঁর চিকিৎসা করতে এলে খান পাঁচ ইনজুরীর কারণ গোপন রেখে মঞ্জু ভদ্রলোকের মিথ্যে মেয়ে সেজে পরিচয় দিয়েছিল। এতদিন ভদ্রলোক মঞ্জুর সাথে যে সম্পর্ক গোপন করেছিলেন মিথ্যে মেয়ে সাজবার কথাতেই ভদ্রলোকের মন থেকে তা বিদায় নেয়। ভদ্রলোক তার জীবনের ভুল বুঝতে পেরে বলেন " মঞ্জু সত্যিই আমার ভুল ভাঙল এতদিনে। এই বন্দুকের গুলি আমায় জানিয়ে দিলে এবার আমার প্রায়শ্চিত্তের সময় হয়েছে। এখন থেকে সত্যিই তুমি আমার মেয়ে – তোমায় কোনো ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব আমি – যৌতুক দেব দশহাজার টাকা। আমি নিজেকে বদলাব, তোমার জীবনকেও বদলে দেব।"[৫৩] পরে মঞ্জু কোনো ভালো ছেলেকে বিয়ে করেনি। বুড়োর খপ্পর থেকে বেরিয়ে আরেক মাঝবয়েসী হিন্দুস্থানীকে সঙ্গী করেছিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনই গল্পটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

'মর্যাদা' গল্পে একটি মুচি সামাজিক ব্যবধান ভুলে গিয়ে একটি কলেজের ছাত্রীকে মনে মনে ভালোবেসে নিজের আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে যখন তাকে সেই মেয়েটি মুচি বলে ডাক দেয় তখন সেই ভালোবাসা প্রেমের স্তরে উন্নীত হলেও একমুহূর্তে ছন্দপতন ঘটে। আঠারো উনিশ বছরের একটি মুচি কলেজ হোস্টেলে জুতো সারাতে এসে একটি মেয়েকে মনে মনে ভালোবেসে নেয়। আস্তে আস্তে মুচিটির মনে প্রেমের উদ্রেক হয়। কম মজুরীতে সে মেয়েটির জুতো সারিয়ে দিত। মেয়েটি পথ চলতে থাকলে সে তাকে ডাক দিয়ে দাঁড় করিয়ে জুতো কালি করে দিত। পুজোর সময় মেয়েটি পুরী বেড়াতে যাবে

- -

৫৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -১০ (গল্প -কুয়াশা), জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪, ১ম মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃ. ২১০

শুনে মুচিও ভাড়ার টাকা যোগাড় করতে থাকে, শুধু তাই নয়, তার পোশাকের মধ্যে ধরা পড়ে পরিবর্তন। কিন্তু যেদিন মেয়েটি হোস্টেল থেকে তাকে মুচি বলে ডেকেছে, সেই দিনই তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। অন্যদিন সে নিজে গিয়ে দোতলা থেকে জুতো নিয়ে আসত, সেদিন সে চাকর দিয়ে জুতো নিচে পাঠিয়ে দিতে বলেছে। কিন্তু চাকর দিয়ে মেয়েটি জুতো পাঠালেও মুচি দুদিন পরে সে জুতো একটি ছোকরাকে দিয়ে ফেরৎ পাঠায়। তারপর শোনা যায় সে মুচির কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছে। এ গল্পে মুচির মানস যন্ত্রণার দিকটিই লক্ষ্য করার বিষয় হয়ে উঠেছে। যে ভালোবাসা এতদিন ধরে সে তিল তিল ধরে মনে পুষ্ট করে তুলছিল, হঠাৎ একদিনের সম্বোধনে তাতে প্রচণ্ড আঘাত আসে। এক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবধান মুচির অন্তরের আকর্ষণকে প্রতিহত করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু যাকে সে মনে মনে ভালোবেসেছিল তার কাছ থেকে এই সম্বোধন সে আশা করেনি।

ললিতা, রিণি আর রত্নাকে আয়ত্ত করে মমতাকেও হাত বাড়িয়ে শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে অনিরুদ্ধ। মমতা যে চালের কলে কাজ করে অনিরুদ্ধ সেই কলেরই মালিকের ছেলে। ঢাকা মেলের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার স্বামী পঙ্গু-বিকলাঙ্গ হয়ে শয্যাগত — এই অবস্থায় তার শিক্ষিতা ও সুন্দরী স্ত্রী মমতা নিরুপায় হয়ে চালের কলে কাজ খুঁজে নেয়। মমতা বুঝতে পেরেছিল, অনিরুদ্ধ তাকে আয়ত্ত করে নিতে চাইবে। তার শক্ত আঙুলের ফাঁসে তাকে পিষ্ট করে ফেলবে। বুঝতে পেরেছিল, অনিরুদ্ধের সবল হাতের কঠিন মুঠি থেকে তার আত্মরক্ষার কোনো পথ নেই। হয়েছিলও তাই। একদিন অনিরুদ্ধের ইচ্ছাতেই মাঠের ভেতরের ঘন নিম আর বিলিতী পাকুড়ের ছায়া ঘেরা নির্জন পথ ধরে আসতে আসতে অনিরুদ্ধ মমতার হাত চেপে ধরে, কিন্তু মমতার হাতের শীতল স্পর্শে অনিরুদ্ধ চমকে যায়। ললিতা, রিণি, রত্নাকে বাগে আনার অভিজ্ঞতা থেকেই সে জানত কিভাবে শবাধারের মধ্য থেকে মৃতকে জাগিয়ে তুলে উত্তাপ সঞ্চার করা যায় রক্তের ভেতরে। কিন্তু সেদিন প্রচণ্ড বজ্র

বৃষ্টির মধ্যে মাঠের ভেতরে একটি শববাহকদের ঘরে (মর্গ) পচা মাংস, ওষুধের গন্ধ, গলিত মৃত দেহের বীভৎস দৃশ্য দেখে অনিরুদ্ধর সমস্ত অনুভূতি অসাড় হয়ে আসে। মনে হয় মমতার মধ্যেই পচা গলা দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহের প্রেত কথা বলছে। শুধু তাই নয়, মমতার সঙ্গে বাড়ি এসে পর্দা ফ্লাস্কের পাশে জমে থাকা পিকদানির মুখে অমানুষিক বিভীষিকা দেখে অনিরুদ্ধর সব সত্তানুভূতি স্তব্ধ হয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে মমতাকে ওর মনে হয়েছিল জীবনের লাশকাটা ঘরের এক প্রেতিনী। মনে হয়েছিল, " যে হাতে সে মমতাকে ছুঁয়েছিল, হাতের সেইখানে ক্লেদ-রস - মাখা একরাশ পচা মাংস জড়িয়ে আছে।" ৫৪
নিরুপায় অনিরুদ্ধ তাই মমতার লাশকাটা ঘর থেকে পাগলের মতো অন্ধকারের ভেতর ছুটে বেরিয়ে আসে। 'মর্গ' গল্পে এই ভাবেই অনিরুদ্ধর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বটি প্রকাশিত হয়েছে।

'তাস' গল্পে অসিত ও রেখা দুজনেই বিবাহিত, কিন্তু তাস খেলাই ওদেরকে কাছে টেনে আনে। অসিতের প্রকৃতি রেখাকে মুগ্ধ করে, আর রেখার দেহশ্রী অসিতকে আকৃষ্ট করে। একদিন তাসের আড্ডা বসল না। সেই অবসরে তারা দুজনে পাহাড়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু সেখানে পাহাড়ী নির্জনতা, ঝর্ণার মৃদু কলঝঙ্কার, নিদ্রালস ঘুঘুর অবিশ্রান্ত ডাকে, [ভেতর] রেখার গানের কলি শুনে, আর মসৃণ কোমল দেহের দিকে তাকিয়ে অসিতের গলা গভীর হয়ে আসে। পাথরের উপরে দুজনে বসে। কিন্তু ঝর্ণার শব্দ, পাখির ডাক, শিশির ঝরার আওয়াজ আর দুজনের পৃথিবীর মাঝখানে অসিতের ভারী কণ্ঠস্বর শুনে রেখা হঠাৎ শিউরে ওঠে। অসিতের নিশ্বাসে তার রক্তের ভেতরে জাগে সীমাহীনভীতি। রেখা বুঝতে পারে — "এতো শুধু তাস নয়! এ ওরা কোথায় চলেছে? এই নিরালা নির্জন শালবনের মধ্য দিয়ে কোন্ ভয়ঙ্কর পথ দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে?" ৫৫
পরক্ষণেই বাড়ি ফিরে এসে রেখা সব তাস পুড়িয়ে ফেলে। অসিত লজ্জায় অপমানে

---

৫৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -৪, (গল্প -মর্গ) ২য় মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৯০, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা - ৪১১

৫৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -৬, (গল্প - তাস), ১ম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৮১, মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা -৩৮

মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে । এ গল্পে তাদেরই মানসিক বিকারের পথে টেনে নিয়ে গেছে অস্তিত্বকে, রেখাকে । কিন্তু গল্পকারের সুকৌশলে তা বিকৃতির পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই রাশ টেনে ধরা হয়েছে ।

'লজ্জা' গল্পে ফিলজফিতে এম.এ পাশ আত্মভোলা মেধাবী ছাত্র বিনয় দুর্গেশবাবুর মেয়ে উজ্জ্বলাকে পড়াত । কিন্তু পড়াশুনার গণ্ডীর বাইরে কখনো বেরিয়ে না এলেও দুর্গেশবাবু এবং বিনয়ের মা উজ্জ্বলার সাথে তার বিয়ে দেবেন স্থির করেন । বিয়ের দিন এগিয়ে এলে বিনয় এ খবর শুনতে পেল, কিন্তু বিয়েতে সে রাজী হল না । এদিকে পাড়ারছেলেরা মিলে কৌশলে এক বৃদ্ধ বর সাজিয়ে পথে সাজানো বরের গাড়ি আটকে পরিস্থিতি এমন জটিল করল যে শেষ পর্যন্ত বিনয় এ বিয়েতে সম্মতি দেয় । কিন্তু বিনয় রাজি হলেও মানসিক দ্বন্দ্ব ক্ষত - বিক্ষত উজ্জ্বলা ছলনা করে, দ্বিধার আশ্রয় নিয়ে, হীন চক্রান্তের মধ্য দিয়ে বিনয়ের সাথে তার জীবন জড়িয়ে নিতে চাইল না । প্রত্যাখ্যাত অপমানিত বৃদ্ধ বরের স্মৃতি তার সারা মন মমবেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে বলেই তেতলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে সে আত্মহত্যা করে ।

'ছায়াসঙ্গিনী' গল্পে টুনু বুঝতে পেরেছিল ডুপ্লিকেট অভিনয়ে তার শান্তি নেই । মিতালীর নকল সেজে সে তার নিজত্বকে ম্লান করেছিল । রূপালি পর্দায় কতবার সে কতরকমভাবে অভিনয় করেবমাধন করে উঠেছে, সাঁওতাল পরগণার পাথরুড়ী নদীতে স্নান করতে গিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা জলে গায়ের রক্ত জমে যাওয়ার মতো হয়েছে, তার শরীরকে ভাঙিয়ে দর্শকের রুচিকে খুশি করবার চেষ্টা হয়েছে অনেক । জঙ্গলের পথ, কাঁটাবন - এসবের মধ্য দিয়ে আসল মিতালী যেখানে অভিনয়ে রাজী হয়নি, সেখানে টুনুই মিতালীর ভূমিকা নিয়েছে — তার কষ্টে দর্শকেরা চোখের জল ফেলেছে — কিন্তু সেও আসল মিতালীর জন্যে । সে বুঝতে পেরেছে — শিল্পী তরুন কুমার আসল মিতালীকেই ভালোবাসেন । মিতালীর বুকে কান্না নেই বলে চোখের জলের জন্যে তরুণ কুমার অবশ্য টুনুর কাছেই ফিরে আসবে । মিতালীকে টুনু মনে মনে হত্যা করতে চেয়েও নিরস্ত হয়েছে কারণ সে জানে আসল মিতালীর

মৃত্যু হলে ওকেও সহমরণে যেতে হবে । তাই পর্দার অভিনয় থেকে মুক্তি খুঁজে নিতে ডুপ্লিকেট অভিনেত্রী টুনু সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে । ডুপ্লিকেট অভিনেত্রী টুনুর ব্যর্থজীবনের অসহায়তাই গল্পটিকে করুণ করে তুলেছে । এটি একটি সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক গল্প ।

'জীবাণু' গল্পের ডাক্তার সারদা প্রসাদের জীবনে একদিন রোমান্স ছিল । প্র্যাকটিস, ল্যাবরেটরী আর প্রেমিকা গ্ল্যাডিসকে নিয়ে সারদা প্রসাদ কামনা করেছিলেন একটি পরিপূর্ণ সুখীজীবন । কুমারী গ্ল্যাডিসের চোখে তিনি দেখেছিলেন সমুদ্র পারের নীলিমা, দেহে দেখেছিলেন আল্পসের তুষার আর রক্তে ইউরোপের জাগ্রত যৌবন । কিন্তু স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্যে সুইজারল্যাণ্ড গিয়ে ঘাড়ের নিচে মেরুদণ্ড যখন ধরা পড়ল টিউবার কুলোসিস তখন সারদাপ্রসাদের জীবনের সব রঙীন স্বপ্ন মুছে যায় । প্র্যাকটিস, ল্যাবরেটরী তাঁর কাছে মিথ্যে হয়ে যায় । ইংলিশ চ্যানেলের নীল জলে রূপসী গ্ল্যাডিসের নীল চোখ যায় ডুবে । অস্ত্রোপচারের পর মুখের সামনে প্রিজমের আয়নাফিট করে সারদা প্রসাদকে দেখতে হয় চারিদিকের দৃশ্য । ব্যর্থ পঙ্গুজীবন নিয়ে সারদাপ্রসাদ পত্র পত্রিকা এলেই খোঁজেন এমন এক বৈজ্ঞানিক তথ্য যা তাঁর ঘাড়ের কাটা হাড়কে নতুন করে জোড়া লাগাতে পারে । জীবনে তিনি চেয়েছিলেন সূর্যালোক প্রদীপ্ত উজ্জ্বল একটি পরিপূর্ণ বাঁচাকে । আঘাত, ব্যথা, দুঃখ, ভুল আর গ্লানির মধ্য দিয়ে কামনা করেছিলেন সমস্ত কিছুর উর্ধে যে জীবন সত্তা, তাকেই । তা যখন হলনা তখন, বৃষ্টি, ঝড়, বরফগলা শীতল ঝর্ণা আর পাইন দেওদারের মর্মরতা নিয়ে পাহাড়ী প্রকৃতির উন্মত্ত উদার প্রেমের মধ্যে তিনি আশ্রয় খুঁজেছিলেন । কিন্তু সেখানেও তাঁর বাংলোর বারান্দায় যৌবনোজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান পাহাড়ী দম্পতির উপস্থিতি তাঁর অন্তরের সুপ্ত বাসনাকেই জাগ্রত করে দেয় । যৌবন ব্যর্থ পরাজিত সারদা প্রসাদ পাহাড়ী দম্পতিকে তাড়িয়ে দিলেও কিন্তু মনে মনে শান্তি পাননি । ওদের দাঁড়াবার জায়গায়

ফিনাইল, নাইজোল স্প্রে করে জীবাণু মুক্ত করতে তিনি চাকরকে বললেন। আসলে সারদা প্রসাদ জীবাণুকে ভয় করেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভয় করেন ওদের পাথুরে শরীরে ও শিরায় প্রবাহিত যৌবনকে।

'দুর্ঘটনা' গল্পে স্কুলমিস্ট্রেস মিস ইন্দিরা চৌধুরীর স্টোভ দুর্ঘটনায় নিজের মুখ পুড়িয়ে ফেলেছেন। কুরূপা ইন্দিরা চৌধুরীর জীবন থেকে সব স্বপ্ন মুছে গেছে। তাঁর এই বঞ্চিত জীবনের অসহায়তা ঈর্ষা হিসেবে গল্পে উপস্থিত হয়েছে। অন্যের জীবনে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সুখ ভোগের সামগ্রী সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েই যেন তাঁর সান্ত্বনা। তাই স্টীমারের সহযাত্রী নব বিবাহিত দম্পতির সুখকর দাম্পত্যজীবনের দিকে তাকিয়ে তার প্রচণ্ড ঈর্ষা হয়েছে। আক্রোশের আগুনে দগ্ধ হয়ে বানিয়ে গল্প বলে সে স্বামী - স্ত্রীর মধ্যে ফাটল ধরাতে চেয়েছে। কিন্তু এই বানিয়ে বলা গল্পে যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই আগুনে নববিবাহিত দম্পতির স্বচ্ছ হাসি মিলিয়ে যায়। পরিবর্তে উভয়ের মনে জমে ওঠে সন্দেহের বিষ।" সকালের রোদ, নদীর জল, নীলাঞ্জন আকাশ, স্টিমারের চাকায় জলের গর্জন, আর তার মধ্যে এক - যুগল তরুণ প্রাণের ছদ্ম - কলহ আর মিষ্টি হাসি, সব কিছু মিলে যখন জীবনটা অপরূপ একটু করো লিরিক কবিতার মত সুন্দর হয়ে উঠেছে, তখনই ইন্দিরা চৌধুরীর মধ্যে জেগে উঠেছে প্রতিহিংস্র কুটিল এক প্রেতিনীমূর্তি। এক মুহূর্তে এই তরুণ যুগলের মুখের হাসি মুছে দিয়ে তাদের মনে সন্দেহের কালো ছায়া বিস্তার ক'রে পৈশাচিক উল্লাসে সে দূরে সরে গেল, গল্প শেষে ইন্দিরা চৌধুরীর নিঃশব্দ অপসরণ সুন্দরের বেদী ভেঙে শয়তানের স্তব্ধ অট্টহাসির মতই হিংস্র বীভৎসতায় পাঠক - মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে।' [৫৬]

- -

৫৬। জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, ৭ম মুদ্রণ, ১৩৯৩, প্রকাশভবন, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি. পৃষ্ঠা - ১১ - ১২

রোমান্টিক গল্প রচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সিদ্ধ হস্ত। বিশেষতঃ নর - নারীর প্রেম মাধুর্যই তাঁর এই ধরণের গল্পের অবলম্বন। কয়েকটি রোমান্টিক গল্পের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে এই ধরণের গল্প রচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশিষ্টতা আলোচনা করা হল।

'বনতুলসী' একটি রোমান্টিক গল্প। এ গল্পের নায়ক রঞ্জনের জীবনে প্রথম নায়িকা তুরী মেয়ের বেশে এসে দেখা দিয়েছিল বনতুলসীর বনে। বনতুলসীর বনে এই মানবিক প্রেমের আবির্ভাব, বাংলাদেশের পাড়াগাঁর অপরূপ বর্ণনা, মাঠ ঘাট, অবারিত দিগন্ত, ধানের ক্ষেত, বনতুলসীর ঝাড়, শরতের সোনা ঝরানো আকাশ, মরা নদী, টেলিগ্রাফের তারে ফিঙে আর বুনো টিয়ের নাচ, কাশফুলের সমারোহ, রঙবেরঙের প্রজাপতি সব মিলে গল্পের রোমান্টিক পরিবেশটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ গল্পে বনতুলসীর সর্বগ্রাসী প্রেমই নায়ককে বনতুলসীর জঙ্গলে টেনে আনে। বন্ধুদের সাথে শিকারের সন্ধানে নায়ক বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু বনতুলসীর নিবিড় হাতছানিতে নায়কের জীবনে পূর্ণ যৌবনা সাঁওতাল মেয়ে আবির্ভূত হয়ে বনতুলসীর জঙ্গলের আড়ালেই মিলিয়ে যায়। কিন্তু নায়িকা মিলিয়ে গেলেও বনতুলসী তার সর্বগ্রাসী প্রেম নিয়ে নায়কের সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে নেয়। ফলে বনতুলসীর কাঁটা - পাতার স্পর্শ ও কটু - কষায় গন্ধের ভেতরে আদিমতার আস্বাদন লাভ করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেও বনতুলসীর ঝাড়ের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে নায়ক নিষ্কৃতি পায়নি। বন্ধুরা এসে উদ্ধার না করলে প্রকৃতি নায়িকার এই দুর্নিবার প্রেম থেকে সে কিছুতেই রক্ষা পেত না। বনতুলসীর বনের অপরূপ বর্ণনা, বনবালিকার আবির্ভাব ও বিদায় এবং প্রকৃতি প্রেমের সর্বগ্রাসী রূপ আশ্চর্য রোমান্টিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে গল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

'ঘাসবন' গল্পে ঘাসবনের ভালোবাসা যেমন নগ্ন নিরাবরণ, ঘাসবনের প্রতিহিংসাও তেমনি নগ্ন, ভয়াবহ। এ গল্পের শ্যামলাল, বাইশ বছরের শক্ত জোয়ান। অনাদ গোখরোয় ভরা ভূতের জাঙ্গাল পেরিয়ে ঘাস বনেই তার

দিন কাটে । কিন্তু একদিন এই দিগন্ত বিস্তারী ঘাসবনে তার চিরশত্রু ঘাটিয়ালের মেয়ে রুকনির আবির্ভাবে ঘাসবনের শান্ত স্তব্ধ পৃথিবী ভরে ওঠে গান আর সুরে । ঘাসবনের আদি অন্তহীন অনাবৃত পৃথিবীতে রুকনি শ্যামলালের মন কেড়ে নেয় । ঘাসবনের অনাবৃত অনায়োজিত সহজ ভালোবাসা, কৃষ্ণপক্ষের রাতের শেষে আকাশের ফালি চাঁদের আলোয় ঘাস বনের রহস্যময়তা, দূরের সাঁওতাল পাড়ার নিবৃতি রাতের বাঁশির সুর, মাদলের শব্দ, রাজহাঁস দলের উড়ে যাওয়া আর বাথানে সুপ্তমদির শ্যামলালের মন সবই রোমান্টিক প্রেমের পরিবেশ ঘনিয়ে তুলেছে । তাছাড়া প্রতিদিন বিকেলের ছায়া ঘনিয়ে আসার আগেই রুকনির আবির্ভাব, নির্জন ভুতের জমীনের পাশে ঘন সবুজ ঘাসের স্নিগ্ধ আবরণে ঢাকানিভৃত নিসর্গতার অপরূপ অবকাশ, প্রজাপতির আনাগোনা, শ্যামলালের বাহুতে রুকনির এলানো শরীর, কণ্ঠের গুণ গুণ সুর, শির শির সোঁ সোঁ শব্দে ঘাসবনের সুর মেলানো গান শ্যামলাল ও রুকনির মিলনের পরিবেশটি সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিয়েছে । শ্যামলাল ভেবেছিল — রুকনিকে নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবে । তাকে বিয়ে করবে । কিন্তু দিগন্তবিস্তারী ঘাসবন, রাঙামাটির টিলা, তালগাছ, আকাশের মেঘে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের রঙ, রুকনির হাসির মতো তালগাছের মাথায় উঁকি দেওয়া চাঁদ, কাঞ্চন নদী, খেয়াঘাট, কাশীপুরের বন্দর একদিকে যেমন তাকে বাথানের দিকে আকর্ষণ করেছে তেমনি রুকনির প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে উতলা করেছে । কিন্তু যেদিন ঘাটিয়াল এসে শ্যামলালকে জানায় রুকনির বর আসবে, দু'সের ভালো ঘিয়ের জোগান দিতে হবে, সেই দিনই শ্যামলাল প্রতিহিংসার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । দিগন্ত জোড়া ঘাসবনে যে প্রেম উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, সেই প্রেম থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে শ্যামলাল । তাই ঘাসবনের নির্জনতায় প্রাপ্ত নির্জন প্রেমকে নির্জন মাঠের খোলা বাতাসেই উড়িয়ে দিয়ে যেন শ্যামলালের শক্তি । শেষ পর্যন্ত বাথানের মর্দা মোষ লেলিয়ে দিয়ে শিঙের গুঁতোয় রুকনিকে সে মেরে ফেলে । ঘাস বনের বুকে উন্মুক্ত প্রেম এমনি করেই প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে । রোমান্টিক গল্প হিসাবে এ গল্পের আবেদন মর্মস্পর্শী ।

'হয়তো' গল্পে ডিভোর্সের ছ'বছর পরে ট্রেনের কামরায় দম্পতির দেখা, কথোপকথন, মঞ্জুশ্রীকর্তৃক সুদেবকে প্রসাদ প্রদান – এ সবের মধ্য দিয়ে সুদেবের মন আকুল হয়ে উঠেছিল মঞ্জুশ্রীকে ফিরে পেতে। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন এসে শেওড়াফুলি স্টেশনে পৌঁছে গেলে মঞ্জুশ্রী নেমে যায়। কারণ সেখানেই সে চাকরী করে। মঞ্জুশ্রীকে গ্রহন করবার মতো মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে সুদেব চেয়েছিল দুজনে মিলে তাদের পূর্বের ভুলের মূলটিকে খুঁজে বের করবে। কিন্তু জীবনের সব তিক্ততা ও গ্লানির ভেতরে দ্বিধাদ্বন্দ্বজড়িত সুদেবের কাছে শুভ মুহূর্তটি কেবল সোনা ছড়িয়ে পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে রইল। উভয়ের মিলন আর সম্ভব হলো না। মিলনের পরিবেশটি তৈরী হতে না হতেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।এ গল্প এই কারণেই রোমান্টিক।

'মহলা' গল্পে নাটকের নায়ক অভিমন্যু চৌধুরী সপ্তদশী কিশোরী জয়ন্তীকে তার নায়িকা করার জন্যে ডেকে বলেছিল, 'শুধু আজকের থিয়েটারেই নয়, আমার জীবনেও তোমাকে নায়িকা করতে চাই। জয়ন্তী, আমি তোমাকে ভালোবাসি।' [৫৭] অপূর্ব মেকআপের গুণে রূপবান অভিমন্যুর রাজপুত্রের মতো চেহারা, অপূর্ব কোমল কণ্ঠস্বর, হাতের স্পর্শ, জীবনের নায়িকা রূপে পাওয়ার আশ্বাস - সব মিলে জয়ন্তী অভিমন্যুর সম্মোহিনী শক্তির সাহায্যে অপূর্ব অভিনয় করে। রেসের ঘোড়াকে মদ খাইয়ে মাঠে নামালে যেমন হয় ঠিক তেমনি অভিমন্যুর দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের নেশায় জয়ন্তী অপূর্ব অভিনয় করে হাত তালি কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু নাটকের পর প্রতীক্ষারত জয়ন্তী অভিমন্যুর কাছে হল উপেক্ষিতা। অভিমন্যু কেবল তাকে নাটকেরই নায়িকা করেছিল, জীবনের নায়িকারূপে নয়। টাকার পরিবর্তে সে জয়ন্তীকে সম্ভোগ করতে চেয়েছে। জয়ন্তী অভিমন্যুকে পায়নি, কিন্তু এইটিই ছিল তার জীবনের সত্যিকারের মহলা

- -

৫৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী ৬(গল্প -মহলা), ১ম মুদ্রণ ১৩৯১,
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ৩৬০

যা পরবর্তীতে তাকে সম্পূর্ণরূপে স্টেজ স্ত্রী করেছে। এ গল্পে অভিনয় ক্ষেত্রে অরুন্ধতীর জীবনের নায়িকায় পরিণত হবার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রোমান্টিক প্রেমানুভূতির স্পর্শে গল্পটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

'হাঁস' গল্পে জলসা গাঁয়ের আদিগন্ত মাঠ, নির্বাধ আকাশ, প্রাগৈতিহাসিক অশ্বত্থবটের জড়াজড়ি, সাদা আকাশের সীমান্তে ফুটন্ত পদ্মকলির মতো প্রথম সূর্য অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে গল্পে রোমান্টিক উপাদান বহন করে এনেছে। তেমনি বিল, টিলা, বুনো হাঁস এসব নিয়ে জলসার মাঝে মাঝে রূপ বদলের মাঝে আছে অপূর্বত্বের ব্যঞ্জনা। বীরেশ্বরের ক্যাটকেটিয়া, দীঘলি, সরালি, জলপিপি চীনে হাঁস শিকার করেও নালপর শিকারের উদ্দাম নেশা যেন তারই জীবনে অবলীলাক্রমে মণীষা মিত্র শোভন চক্রবর্তী, সুরমা রায়কে পেছনে ফেলে এসে মঞ্জু দত্তকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষায় সমতুল হয়ে উঠেছে। জলসার আশ্চর্য রোমান্টিক পরিবেশে হাঁস আর নায়িকা এক হয়ে গেছে। বীরেশ্বর হাঁস শিকার করতে পারেনি। ঘাস বনে পথ হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে।
'ঘাসবনের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা বীরেশ্বরের দেহটাকে ঘিরে সারা রাত নাচতে লাগল আলেয়া, — হাঁসের ডাক প্রহরেরপর প্রহর ধরে প্রেত অন্ধকারটাকে মুখর করে রাখল মঞ্জু দত্তর উচ্ছলিত হাসির মতো।' [৫৮]

'বৃষ্টি' গল্পটিও রোমান্টিক। পঙ্কজ ও নন্দিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কৃত্রিম বিরোধ, সাজানো স্বামী - স্ত্রীর প্রসঙ্গ যেমন গল্পের অঙ্গীভূত তেমনি এক বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যায় বিদ্যুতের চমক, মেঘের গুরুগুরু ডাক, ইউক্যালিপটাসের অশান্ত আন্দোলনের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারী স্কুলের নিভৃত অবকাশে উভয়ের ক্ষণিক সান্নিধ্য দুজনের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে মিলনকে

- -

৫৮. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী৯(গল্প - হাঁস), ১ম প্রকাশ ১৩৯২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২১০

সম্ভব করে তুলেছে । এ গল্পের রোমান্টিক পরিমণ্ডল রচনা এইভাবেই হয়েছে সার্থক ।

'অনেকবেশী আকাশ' গল্পে উত্তরপাড়ার মেয়ে কনকলতার বিষণ্ণ শান্ত মুখের কোমল রেখা , গুম্ফিত টাঙ্কু রোডের পাশে সবুজ পাতার শিরশিরানি, গঙ্গার উদার উজ্জ্বলতা , নির্জন ঘাট , ঠান্ডা জল , হাওয়া আর অনেক বড় আকাশ রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে কুমার কান্তির হৃদয়কে আকর্ষণ করেছে । ফলে প্রতিদিনের দু:সহ নাগপাশে জড়ানো অভ্যস্ত জীবন , নিজের রক্ত নির্যাসের মতো মাইনে, মেসের অমৃত আরদেশের বাড়ি থেকে আসা স্ত্রীর চিঠির প্রতি আতঙ্কগ্রস্ত জীবন নিয়ে মুক্তির আস্বাদন পেতে কুমারকান্তি ছুটে এসেছিল উত্তর পাড়ায় কনকলতার বাড়িতে । নিজের পরিবারকে বঞ্চিত করে কনকলতার মন জয় করার জন্যে সে টাকা ধার দিত , চকোলেট , শাড়ি আর সাবানে ভরিয়ে দিত তার মন । কনকলতারই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে কুমারকান্তি চেয়েছিল কলকাতার ভিড় আর অপরিচ্ছন্ন বদ্ধজীবন থেকে মুক্তি নিয়ে উত্তরপাড়ার গঙ্গা , খোলা আকাশের স্পর্শে শান্তি খুঁজে পাবে । কিন্তু সেখানেও বার্নিশ কালো হয়ে আসা জীর্ণতার ছোপ মাখা টেবিল চেয়ার , ঘরের পুরনো চুনবালির গন্ধ , অসহ্য গরম ভাইবোন পরিবৃত কনকলতার অভাবের সংসারে শীর্ণক্লান্ত কঙ্কাল সার মায়ের শান্ত বিষণ্ণ মুখ কৃতজ্ঞতার ভাষা , নিবিবরণ দেওয়ালে টাঙানো কুমারি কান্তির ছবি কুমারকান্তির মনে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দেয় । তাছাড়া তাকে দেখবার জন্যে কৌতূহলী মেয়েদের ভিড় তার ও কনকলতার মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য একটুও অবসর দেয়নি । তাই কুমারকান্তি সেখান থেকে ছুটে স্টেশনে চলে আসে । বহুদিন পরে কনকলতাকে দেওয়া টাকা আদায় করে নেবার জন্যে সে চিঠি লিখেছিল , কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বে সে চিঠি তাকে দিতে পারেনি । রোমান্টিক গল্প হিসাবে এ গল্পের মূল্য কম নয় ।

'বনজ্যোৎস্নায়' ভরাবর্ষার জলঢাকা, ভুটানের কালো পাহাড়ের তলায় ডুয়ার্সের ছেদহীন অরণ্য, জঙ্গলের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া, রাত্রিতে মাতাল করা বনজ্যোৎস্নায় পুষ্পিত ভারতবর্ষের মুক্তির সঙ্কল্প ভুলে পাহাড়ী মেয়ে পিউকুমারীর সঙ্গে স্বাধীনতাসংগ্রামী মহীতোষের প্রেম গল্পে রোমান্টিক আবহ রচনা করেছে। এ গল্পে প্রেমের উন্মাদনায় দুষ্ট বনদেওর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মহীতোষ আর পিউকুমারী পালিয়ে সিকিমে চলে যেতে চায়। পিউকুমারী প্রেমের মূল্য দিতেই এক রাতের শুচিতা নষ্ট করার মধ্য দিয়ে তিনশো টাকা সংগ্রহ করে এসেও মহীতোষকে পায়নি। অরবিন্দ এসে মহীতোষকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় আরেক নতুন আশ্রয়ে। তাই বনজ্যোৎস্না নয় বনদাবাগ্নিতে পিউকুমারীকে বনদেওর আগুনে পুড়ে ছাই হতে হল। এ গল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শের কাছে মানসিক প্রেম পরাজিত হয়েছে, কিন্তু যে আকুলতা, যে উন্মাদনায় মহীতোষ আর ভুটানী বালিকা পিউকুমারীর মধ্যে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছিল তার মূল্য কোন অংশে কম নয়। এই গুণেই গল্পটি রোমান্টিক।

'মদনভস্ম' একটি রোমান্টিক গল্প। বহু কষ্টে সংগ্রহ করা সময় নিয়ে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জীবনের সব চিন্তাকে ভুলে যেতে এক সন্ধ্যায় জলের ধারে গাছের ফাঁকে ঝুলন্ত চাঁদ আর ফুলের গন্ধের ভেতরে আরো অনেক জোড়া বাঁধা প্রেমিক প্রেমিকার মাঝে জীবনের নতুন কথা, নতুন তারা, কবিতার লাইন আর গানের সুর খুঁজতে চেয়েছিল, কিন্তু কিছুই তাদের পাওয়া হয়নি। কাকাকে খারাপ কথা বলার জন্যে ছেলেটির মন খারাপ ছোট ভাইয়ের জ্বর, বি.টি. ও এম.এড্ পড়ার স্বপ্ন, মেয়েটির চাকরী, শর্টহ্যান্ড ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এসে মন খারাপ। তাই আসল কথাটি আর তাদের বলা হয়নি। অথচ ঠিক সেই সময়েই কয়েকজন গুণ্ডা এসে ভদ্রব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা হাতঘড়ি নিয়ে চলে যায়। দিনরাত অপেক্ষা করে আসল কথা বলার আয়োজন করা মুহূর্তও দিনরাত্রির সব ভীড় ওদের দুজনের মাঝখানের আধ হাত জায়গাও দখল করে নেয়। রোমান্টিক গল্পের সব বৈশিষ্ট্যই এ গল্পে ফুটে উঠেছে।

'মধুবন্তী' গল্পে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে আয়োজিত চায়ের সন্ধ্যা, দক্ষিণের খোলা বারান্দায় টবের ফুলে বসন্তের হাওয়া, ঝাউয়ের পাতায় সমুদ্রের শব্দ, সেতারের মধুবন্তী রাগ চিত্তর মনে বারো বছর আগের রোমান্টিক প্রেমানুভূতিকে জাগিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় যতীন কাকার মেয়ে জয়াকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে চিত্ত সাপ খোপ - বুনো শুয়োরের ভীতিতে তুচ্ছ করে সাঁকো পেরিয়ে যতীন কাকার বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেখানে তো দক্ষিণের খোলা বারান্দা ছিল না, ঝাউপাতায় সমুদ্র মর্মর তুলে সেখানে বাতাস বয়নি এবং সেখানে সেতারের মধুবন্তী রাগ বারো বছর আগের স্মৃতিকে সুপ্নময় করে তোলেনি। যে প্রতিশ্রুতি সে জয়াকে দিয়েছিল তা সেখানে হোগলা বনের কালো কাদার নিচে খুন হওয়া মানুষের হাড়ের টুকরোর সঙ্গে মিশে ছিল। তাই বারো বছর পরে যতীন কাকার বাড়ি থেকে বিদায় নেবার পথে জয়া যখন তাকে লন্ঠন ধরে নিরাপদে পুল পার করে দিয়েছে, লন্ঠন মাটিতে রেখে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে তখন চিত্ত ভেবেছিল; "এই মুহূর্তে জয়া কোমল, রমনীয় হয়ে উঠেছে। মাত্র এই মুহূর্তে আমি ওর হাতখানাকে আবার টেনে আনতে পারি স্বপ্নের ভেতরে।" [৫১] কিন্তু বারো বছর আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা আর সম্ভব হল না। কুকুরের কর্কশতাকে দুজনের মিলনের যে রোমান্টিক মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই জয়া অন্ধকারে ঘাসের মধ্য দিয়ে ফিরে চলে যায়। বারো বছর আগের মুহূর্তটিকে কাছে পেয়েও সদ্ব্যবহার করতে পারেনি চিত্ত। জয়াকে পাওয়া সম্ভব হলনা, কিন্তু দক্ষিণের খোলা বারান্দায় বসে সেতার শুনতে শুনতে সে জয়ার কথা ভাবতে পারবে — এর মূল্য কোন অংশে কম নয়। সুতরাং রোমান্টিক গল্প হিসাবে মধুবন্তী এক আশ্চর্য সুন্দর গল্প।

---

৫১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -১১(গল্প -মধুবন্তী), ১ম মুদ্রণ ১৩৯৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃষ্ঠা -২২১

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পকে নারী পুরুষের প্রণয়গত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে । এই ধরণের গল্প রচনার ক্ষেত্রে লেখক নরনারীর দাম্পত্যজীবনকেই গ্রহণ করেছেন । লেখক তাঁর সাহিত্যে ছোটগল্পগ্রন্থে বলেছেন , " প্রেম , ঘৃণা , মিলন , বিরহ , হিংসা কুট - কামনা , অন্তর্দ্বন্দ্ব , সমাজে নারীর মূল্য সবই এর মধ্যে আশ্রিত । এর সঙ্গে সমাজ সমস্যা মিলে থাকে , মনস্তত্ত্ব প্রায়ই একে পরিবহন করে , রোমান্স এবং কাব্য - সৌন্দর্য একে ঘিরে থাকে জ্যোতির্মণ্ডলের মতো । এ হল মানুষের সর্বাধিক গল্প , সর্বশেষ সবচেয়ে প্রিয় গল্প ।" [৬০] কয়েকটি ছোট গল্প আলোচনা করে এই শ্রেণীর গল্প রচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দক্ষতা আলোচনা করা যাক ।

'কাণ্ডারী' গল্পে আটচল্লিশ বছরের অখিল ঘোষের সাথে তেইশ বছরের অলকার দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি । অখিল ঘোষ স্ত্রীর কাছ থেকে কোনদিনই ভালোবাসা পায়নি । তার নিগ্রোর মতো গায়ের রঙ , চ্যাপটা ঠোঁট , সাদা মার্বেলের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ হয়তো অলকার ভালো লাগেনি । অখিল একদিন ভালো ফুটবল খেলতো তার শরীরে চর্বি জমেছে , চেহারা হয়েছে ফুটবলের মতো গোল । আই.এ. ক্লাসে সে তিনবার ফেল করেছে এবং সপ্তাহে অন্তত তিনদিন সে ক্লাব থেকে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে । শুভদৃষ্টির সময় তাকে দেখেই অলকা আতঙ্কে চোখ বুজে এবং ফুলশয্যার রাতে আদরে সোহাগে একটুকরো কাঠের ভেতরে প্রাণসঞ্চারের ব্যর্থ প্রয়াস করেছিল অখিল ঘোষ । টাকা , কাঠের ব্যবসা , চায়ের দালালি , বাড়ি , গাড়ি সব থাকা সত্ত্বেও অলকার মনকে এসব দিয়ে সে ভরিয়ে দিতে পারেনি । এমনকি চার হাজার টাকার হীরের আংটি দিয়েও সে অলকাকে সন্তুষ্ট করতেপারেনি । সুস্থ স্বাভাবিক চরিত্রবান প্রত্যপকেসে তার কাঠের কারখানার ভার দিয়েছিল ।

- -

৬০ . নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প , শ্রাবণ , ১৩৮৪ , পঞ্চম সংস্করণ , ডি.এম.লাইব্রেরী , পৃষ্ঠা - ৩১৫

মিষ্টি গানের গলা আর ভালো টেনিস খেলোয়ার প্রতাপের সুশ্রী চেহারা আর বয়স ত্রিশ বছর হলেও অলকা তাকে দেবর হিসাবেই দেখেছে। কিন্ত পাশাপাশি অখিলকেও সে ঘৃণা করেছে। অথচ দুর্গম পাহাড়ী পথে অখিলের হাত থেকে স্টিয়ারিং নিয়ে প্রতাপ জীপ চালাতে গিয়ে একটি ভয়ঙ্কর জেডের ধাক্কাধাক্কি এসে যখন একটি অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে বেঁচে যায় তখন অলকা প্রতাপকেই আনাড়ী মনে করেছে এবং তার হাত থেকে স্টিয়ারিং কেড়ে নিয়ে অখিলের হাতে তুলে দিয়েছে। কারণ সে বুঝতে পেরেছে প্রতাপ নয়, অখিলই ভালো ড্রাইভার। তাই সে প্রতাপকে উদ্দেশ্য করে বলে ছিল যে খালি টেনিস খেলতে পারলে আর গান গাইলেই সংসারে সব পাওয়া যায় না। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে অলকা অখিলকে যোগ্য বলে মনে করেনি, পাহাড়ী পথে বিপজ্জনক মুহূর্তে সেই অখিলকেই একমাত্র ভরসা করেছে।

'প্রতিপক্ষ' গল্পে গানই প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করেছে। ভালো গায়ক ইন্দু শিখাকে বিয়ে করার পর সুর আর প্রেমে তাদের দুজনের জীবনের আকাশ ভরে উঠেছিল। বাজারে দুচারখানা রেকর্ড বের হতে না হতেই ইন্দু বেশ সুনাম অর্জন করে নেয়। শিখা গান গাইত রেডিয়োতে। ইন্দুর সাথে গ্রামোফোনে ডুয়েট গাইবার সখ ছিল তার। গ্রামোফোন কোম্পানীর আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। পুজোর আসরে, অফিসে, কলেজ সোস্যালে, জলসায় যেখানে ইন্দুর ডাক আসে, সেখানে শিখার ডাক পড়ে না। কিন্ত ইন্দুর সাথে গান গাইলেও শিখার গান শুনে দর্শক ও কর্তৃপক্ষ কটুক্তি বর্ষণ করে শিখাকে। ইন্দু শিখাকে তা বুঝতে দেয়নি। নিজের ব্যাগ থেকে পার্টির নাম করে টাকা তুলে দিত শিখার হাতে। টাকার উপর আকর্ষণ শিখার ছিল না, আর্টিস্ট হিসাবে স্বীকৃতিই চেয়েছিল সে। একটা বড় জলসার আসরে গান গাইবার পর শিখা তাকে উদ্দেশ্য করে কর্তৃপক্ষের কটুক্তি শুনে লজ্জায় ভেঙে পড়ে। দুজনের মধ্যে গান যখন প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিল তখন ইন্দু আপ্রাণ চেষ্টা করেছে শিখার মন রক্ষা করতে, কিন্ত আসল সত্য বেরিয়ে আসবার পর শিখার জীবনের এই পরাজয়

ইন্দুকে ব্যথিত করে। তাই গান ছেড়ে দিয়ে ইন্দু হয়েছে দোকানদার, কারণ গানের চেয়ে শিখাকেই সে ভালোবাসত বেশী। গান দুজনের মাঝখানে প্রতিপক্ষ হয়ে উঠুক, দুজনকে বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট করে দিক — এটি ইন্দু মানতে পারেনি। এই কারণেই হারমোনিয়াম, তানপুরা ও বাঁয়া - তবলা বিক্রী ও দান করে দোকানদারী করেই সে শান্তি খুঁজে নিতে চেয়েছে, অন্যদিকে শিখা গান ছেড়ে দিয়ে কর্পোরেশনের স্কুলে শিক্ষিকায় পরিণত হয়েছে, গানের শিক্ষিকা নয়।

'গিলটি' গল্পে বাড়ি আর জমির দালাল হিমাংশু ঘোষাল নেশা আর জুয়া খেলায় তার আয়ের মোটা অংশ ব্যয় করলেও স্ত্রী গৌরী তাকে ভালোবাসত ঠিকই। অনেক রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে হিমাংশুও গৌরীকে বলত গা ভর্তি গয়না না হলে তাকে মানায় না। গৌরীর গলায় গিলটির হার তার কাছে এক চরম লজ্জা। কাজেই ট্রান্সাকশনের টাকা পেয়ে গৌরীর জন্যে গয়না বানানোর অভিলাষ পোষণ করে সে। কিন্তু দরকার টাকা। এই কারণেই যাদুকরের মতো একশো টাকাকে তিনশো টাকায় পরিণত করার জন্যে হিমাংশু জুয়ার আসরের দিকে বেরিয়ে পড়ে। পকেটেমাত্র সাত আনা পয়সা নিয়ে রাত বারোটায় বাড়ির গলিতে সে পা বাড়ায় এবং সেই অবস্থায় তিনজন গুণ্ডার হাতে সে যখন আক্রান্ত হয় তখন গৌরীই তার হারছড়া খুলে দিয়ে গুণ্ডাদের কাছ থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনে। কিন্তু হিমাংশু জানত হারটি গিলটির, আসলে তা গিলটির ছিল না, হিমাংশুর ভালোবাসাই ছিল গিলটির করা।

'অমনোনীতা' গল্পেও আছে দাম্পত্য সমস্যা। লোকেন মণিকাকে বিয়ে করেও মনে মনে শান্তি পায়নি। কারণ বন্ধু সুখেনের মুখে সে শুনেছে — দুলাল চৌধুরী নামে এক চব্বিশ বছরের যুবকের সঙ্গে মণিকার বিয়ের কথা হয়েও ভেঙে গিয়েছিল। পরে দুলাল চৌধুরী অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। বিয়ের দু মাসের মধ্যে অবশ্য মণিকার সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ লোকেন পায়নি। মণিকা কেবল তার রূপে নয়, স্নেহে সেবায় আর ভালোবাসায় ভরে দিয়েছিল

লোকেনকে । দুলালের উপর একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ মিছিমিছি লোকেনকে চিন্তিত করে তোলে । দুলালের মধ্যে সে কোন আর্টিস্টকে খুঁজে পায়নি । কোন গভীরতাও ছিল না তার । কেবল ভলিবল খেলতে, দুহাতে ধরে কাটলেট খেতেই সে জানত । লোকেন ভেবেছে, মণিকার মতো সুন্দরী বিদুষী স্ত্রীর কাছে দুলাল বড়ই বেমানান । শেষ পর্যন্ত সত্যঘটনাটি জানার কৌতূহলে লোকেন মণিকাকে দুলাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । মণিকা তাতে রাগ করেনি, এমনকি দুলালের মৃত্যুর খবর শুনেও কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেনি । দুলাল বেঁচে থাকলেই সে ওর দুটো দাঁত উড়িয়ে দিয়ে আসত । কিন্তু গল্পের শেষেও লোকেন মুগ্ধ মণিকাকে জানিয়ে দুলাল সম্পর্কে তথ্য জানতে চেয়েছে । দুলাল চৌধুরীর অস্তিত্বের কথা লোকেনের মনে এমন বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি করেছিল যা কোনোদিন তার মন থেকে মুছে যায়নি ।

'অভিনয়' গল্পে প্রদ্যুৎ ও সবিতার মধ্যে দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত হয় প্রদ্যুতের দূর সম্পর্কের পিসীমাকে যখন প্রদ্যুৎ কাশী থেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন । কারণ পিসীমা তাঁর আচার নিষ্ঠা ও সঙ্কীর্ণ যুযুৎসু মন নিয়ে সর্বদাই বিরক্ত হয়ে থাকেন । বাড়িতে মুরগী আনা হলে, সবিতার ক্রীশ্চানবান্ধবীর আগমনে হলে, কিংবা সবিতার ছোট ভাই মুকুলের কুকুরের উপস্থিতি দেখলে পিসীমা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়তেন । পিসীমার এই দুর্ব্যবহারে সবিতা প্রদ্যুৎকেই দোষারোপ করে বকুলবাগানে তার বাপের বাড়িতে চলে যায় । কিন্তু প্রদ্যুতের অনুরোধ উপেক্ষা করে সে যখন বকুলবাগানেই দিন কাটাতে থাকে তখন সবিতারই ভাই মুকুল পরামর্শ দেয় সবিতার ডুপ্লিকেট সাজিয়ে কৃত্রিম প্রেমাভিনয় করতে । ফলত তাই, প্রদ্যুৎ তার অফিসের টাইপিস্ট মায়াকে রাজী করিয়ে তার সাথে প্রেমের অভিনয় করে । বোটানিক্সে, কাপড়ের দোকানে এবং সবশেষে সিনেমা হলে প্রদ্যুতের সাথে মায়াকে দেখে সবিতারমনে তীব্র ঈর্ষা জাগে । এই কারণে সিনেমা হলেই ইন্টারভেলের সময় সবিতা মুকুলকে দিয়ে প্রদ্যুৎকে ডাকিয়ে আনে । এইভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে তাদের দাম্পত্য কলহের অবসান হয় এবং দুজনের

মধ্যে পুনরায় মিলন সূচিত হয় ।

'সেই পাখিটা' গল্পে তুষার ঝরা শীতের রাতে দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে সঞ্জীব তার ডিভোর্সী স্ত্রী সুনন্দার কাছে এসেছিল আশ্রয়ের জন্যে । সঞ্জীব ক্ষমা চেয়েছিল তার কৃতকর্মের জন্যে । কিন্তু সুনন্দা সঞ্জীবকে ক্ষমা করতে পারেনি । কারণ সুনন্দা ট্রেনিং এ থাকাকালীন সঞ্জীব এক সাবডিভিশনাল টাউনে চাকরী করতে গিয়ে পাশের বাড়ির অত্যন্ত দুঃস্থ মেয়ে নীহারিকাকে বিনা পয়সায় পড়াত । পরে সেই নীহারিকাকেই সে বিয়ে করে। নীহারিকা অবশ্য আত্ম-হত্যা করে মারা যায় । তবু সুনন্দার রাগ প্রশমিত হয়নি । সঞ্জীবকে সে এক্সপার্টি ডিভোর্স করেছে । ভিক্ষুকের মতো কাতর আকুতি জানিয়েছিল সঞ্জীব, কিন্তু সুনন্দার কাছে সে তবুও উপেক্ষিত হয়েছে । ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, শয়তান বিশেষণ হয়েছে তার প্রাপ্য । কৃত্রিম স্বামীর প্রসঙ্গ টেনে সুনন্দা সঞ্জীবকে হতাশ করেছে । চরম ব্যর্থতা নিয়ে সঞ্জীব তার কাছে ক্ষমা চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়ে তুষার ঝরা পাহাড়ী পথ ধরে নেমে আসতে থাকে । শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সঞ্জীবের অসুস্থ শীর্ণ মুখ, গায়ের ছেঁড়া কোট, শীতে জমে যাওয়ার মতো পোশাক আর বিপজ্জনক পথের কথা ভেবে সুনন্দা তাকে পিছন থেকে ডেকেছে । কিন্তু সঞ্জীব ফিরে আসেনি, আসতে পারেনি, দুর্বল অবসন্ন শরীর নিয়ে তুষারে ঢাকা পথে লুটিয়ে পড়ে ।

'দর্পণ' গল্পে নাটকে ফিমেল পার্ট করতে করতে চারুর স্বভাব মেয়েলী ধরণের হয়ে যায় । পূর্বে অবশ্য এই নিয়ে তার জীবনে কোন সমস্যা ছিল না । চারু ব্যাঙ্কের কেরাণী । বন্ধুবান্ধব ও অফিসের সবাই তার মেয়েলী ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে চারুবালা নামে ডেকে ঠাট্টা ও রসিকতা করত । কিন্তু বিপদ ঘটে চারুর বিয়ের পর । ঢ্যাঙা চেহারার মেয়ে কমলার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল । বিয়ের পর কমলা চারুর এই মেয়েলী জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় । ছেঁড়া কাপড় পড়তেও কমলার আপত্তি নেই । তিনদিন উপোস সে করতে পারে, কিন্তু মেয়েলী পুরুষকে সে সইতে পারে না । গোপাল ডাক্তারের ছোটবোন টেপীর প্রেমপত্র মণীশের কাছে পৌঁছে দিবার দায়িত্ব নিয়েছিল চারু ।

কিন্তু চারু জানতে না পারলেও সে চিঠি পকেট থেকে পড়ে কমলার হাতেই পৌঁছয়। এই ঘটনায় চারুর প্রতি কমলা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেইদিনই কমলার কালো ভয়ঙ্কর মুখ দেখে চারু ক্লাবে গিয়ে সারাজীবনের জন্যে ফিমেল পার্ট ছেড়ে দিতে মনস্থ করে।

'নীলকণ্ঠ' পুরোপুরি দাম্পত্য কলহের গল্প। সুকুমার ও অনুশ্রীর দাম্পত্য কলহে ভরা দৈনন্দিন জীবনের বিষপান করে তাদের ছ'বছরের মেয়ে খুকু তিলে তিলে বিষের জ্বালায় নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অফিস ফেরত সুকুমার সারাদিনের ক্লান্তির শেষে বাড়ি এসে একটু শান্তি একটু আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু অনুশ্রীর কাছ থেকে সে কেবলই পেয়েছে অবহেলা ও প্রত্যাখ্যান। অথচ সুকুমার তাকে ছেড়ে দূরে চলে যাক এমনটিও অনুশ্রী চায়না। একদিনের জন্য সে কলকাতার বাইরে গেলে অনুশ্রী ছটফট করে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাই চারিদিকের দুর্যোগের ভেতরে সুকুমার অনুশ্রীর কাছেই আশ্রয় খোঁজে, কিন্তু অনুশ্রীকে সে একান্ত করে আশ্রয় দিতে পারে না। অনুশ্রী চেয়েছিল - সুকুমার তার পৌরুষ দিয়ে চারপাশের অপমান থেকে তাকে রক্ষা করবে, তাকে মর্যাদা দেবে, মূল্য দেবে তার ত্যাগের আর ভালোবাসার। কিন্তু অনুশ্রীর এই চাওয়াটুকু সুকুমার পূর্ণ করতে পারেনি। তাদের দুজনের মাঝখানে সেতুবন্ধন করেছিল তাদের ছ'বছরের মেয়ে খুকু। মায়ের চোখে জল দেখলে সে মুছে দেয়, বাবার মুখ গম্ভীর দেখলে দু হাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও খোঁজে বাবা মাকে। সুকুমার ভেবে নিয়েছিল খুকুর জন্যেই নীলকণ্ঠের মতো প্রতিদিনের বিষপান করে তাকে বাঁচতে হবে। এই কারণে একদিন ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা করার কথা ভেবেও তা সে করতে পারেনি। অনুশ্রীও রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে। সেদিন শেষবারের মতো খুকুকে দেখতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছে - ঝড়জলের মধ্যে খুকু ছাদে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে। তার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে যাত্রায়

খুকু সুস্থ হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু তার প্রলাপের মধ্য দিয়ে সে জানতে চেয়েছে কেন রাতদিন ঝগড়া করে তার বাবা মা ? কেন তার বাবা না খেয়ে অফিসে যায় ? কেন তার মা অমন করে কাঁদে ? — এই ঘটনায় অনুশ্রী ও সুকুমারের চেতনা ফিরে আসে । দুজনেই বুঝতে পারে — এক তুচ্ছ অর্থহীন মনোবিকারে আচ্ছন্ন চোখে ওরা খুকুর ওপরে বড়ই অবিচার করেছে ; দিনের পর দিন নিরপরাধ, নির্মম সন্তানকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলেছে । দাম্পত্য কলহের গল্প হিসাবে এ গল্প সার্থক ।

'জরতী' গল্পে কলকাতার বদ্ধ গলিতে ছেলেবেলার আকাশ আর ছেলেবেলার মন দিয়ে অমিয় মিত্র শেফালী ব্যানার্জীকে দেবরদের সম্পত্তি কেন্দ্রের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে । শেফালীর চার বছরের রিকেটী ছেলেটাকে মনের মতো মানুষ করার আনন্দে অমিয় দিশেহারা । তবুও শেফালী অমিয়কে ছেড়ে পালিয়ে যায় পশ্চিমের শহরে । শেফালী পুরুষ অমিয়র যৌবনের শক্তিতে নিজেকে ফিরে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পেরেছে তার জড়তা আর জরার মতো মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে আর কিছুই নেই । সে বুঝতে পেরেছিল, অমিয় তার যৌবন দিয়ে তাকে দীক্ষা দিতে পারেনি, উল্টো পাঠ নিয়েছে তারই বার্ধক্যের । অমিয় তাকে জয় করতে পারেনি, পরাজিত হয়েছে তার কাছে । এই কারণেই শেফালীর কুশ্রী বিকলাঙ্গ ছেলেটাকে প্রাণ দিয়ে সে স্নেহ করেছে । মা হয়ে যে ছেলেটিকে শেফালীর ইচ্ছে হয়েছিল ঘৃণা করতে অমিয় তাকেই দারুণভাবে আঁকড়ে রেখেছিল । শেফালী ও অমিয়র মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল, কিন্তু অমিয় শেফালির সাথে ছন্দ মেলানোর জন্যেই তার মনের বয়সকে বাড়িয়ে দিয়েছিল । শেফালীর কাছে অমিয়র এই বিপর্যয় দুর্ঘটনার মতো — এ যেন অমিয়র জীবনের এক বড় ট্র্যাজেডি । অমিয়র কাছ থেকে এই জন্যেই সে পালিয়ে গিয়েছিল । নারী পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রেমাত্মক গল্প হিসাবে

তাই 'তরতী' গল্পটি সুন্দর হয়েছে ।

প্রতীকধর্মী গল্প রচনাতেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সার্থকতা অর্জন করেছেন । 'সাপের মাথার মণি' নামক গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে প্রতীকধর্মিতা লক্ষ্য করা যায় । নিম্নে তাঁর কয়েকটি প্রতীকধর্মী গল্পের আলোচনা করা গেল ।

'চাবি' গল্পে গায়ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর পর অহিভূষণের কাছে জীবন বড়ই দুঃসহ হয়ে উঠেছিল । গায়ত্রীই ছিল তার জীবনের সবকিছু । কলকাতার ফ্ল্যাট , ড্রেসিং টেবিলে বিয়ের সময়ের ছবি , আলনায় রাখা শাড়ি , জামা , চটি , অর্গানের ওপরে রাখা স্বরবিতান , কাচের আলমারিতে রাখা কৃষ্ণনগরের পুতুল , শেলফের বই সবই গায়ত্রীর সঙ্গে তার বন্ধনের প্রতীক হিসাবে কাজ করে । তাই গায়ত্রীবিহীন সংসারে তার কাছে ফ্ল্যাট , অফিস , ইনক্রিমেন্ট , ঘড়ি মিলিয়ে বাড়ি ফেরা ও লাইনে দাঁড়িয়ে সিনেমার টিকিট কেনার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে । কিন্তু তার প্রতিদিনের জীবনের প্রতিক্ষণে গায়ত্রীর উপস্থিতি যখন একান্তই প্রয়োজন এবং গায়ত্রীর অভাব যখন তার মনে অসীম শূন্যতা ছড়িয়েছে তখন এই দুর্বিষহ শোকের মধ্যে অনুপমবাবুর মেয়ে জয়া মিষ্টি জল আর চায়ের পেয়ালা হাতে করে এসে তাকে জামা কাপড় ছাড়তে বলে তারই হাতের চাবি নিয়ে ট্রাঙ্কের তালা খুলে দিলে তার শোকস্তব্ধ হৃদয়ের তালাও খুলে দিয়েছে । অহিভূষণের শোকস্তব্ধ হৃদয়ের প্রতীক হল তালাবন্ধ ট্রাঙ্ক আর চাবি হল সেই শোকস্তব্ধতা কাটিয়ে ওঠার প্রতীক । ট্রাঙ্কের তালা খুলে দিয়ে জয়া যেন অহিভূষণের শোকস্তব্ধ হৃদয়ের তালাও খুলে দিয়েছিল । নইলে বাক্সের চাবি খুলে যাওয়ার পর অহিভূষণের কেন মনে হবে —'পাঁচ দিন সে দাড়ি কামায়নি , ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় কী বিশ্রী , কী বুনো দেখাচ্ছে তার চেহারা ।' [৬১] এটি শুধু

---

৬১ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাপের মাথার মণি , ১ম প্রকাশ , ১৩৬৬ , ওরিয়েন্ট বুক হাউস , কলিকাতা - ৩০ , পৃষ্ঠা - ৬৫

অম্বিভূষণের শোকমোচনের ইঙ্গিতই নয়, এতে জয়ার প্রতি একটি দুর্বলতাও তার মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'খাঁচা' গল্পে সরোজদের ভাড়াটে ডুমুরফুলের মেয়ে বুনো অর্থাৎ বনানীর পোষা টিয়ে খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে যায়। মগডালে উঠে বনানী সেটিকে ধরে আনে। তাতে সরোজ আতঙ্কিত হয়ে ভবিষ্যতে যাতে বনানীর পুরনো খাঁচা থেকে পাখিটা পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্যে খাঁচা হাতে বনানীর মায়ের কাছ হাজির হয়। বনানীর মা সরোজকে দেখে বলেছিল, 'বুনোর একটা খাঁচা এখন সত্যিই দরকার।'[৬২] খাঁচা এখানে বন্ধনের প্রতীক। বনানী এতদিন চাঞ্চল্য নিয়ে বুনো টিয়ের মতোই ছিল দুরন্ত। সরোজের হাতের খাঁচা বনানীর টিয়ের জন্যে আনা হলেও সেই খাঁচাতে বনানীকে আবদ্ধ করার প্রয়াসই ধরা পড়ে। তাছাড়া সরোজের মায়েরও ইচ্ছে ছিল বনানীর সঙ্গে সরোজের বিয়ে দেবার।

'ব্লেড' গল্পে বয়স চল্লিশ হলেও তারুণ্য বিদায় দিতে নারাজ হিরণ্য সোম। বিশেষত অফিসের নতুন সহকর্মী কুমারী শিখা ঘোষ আসার পর তারুণ্যকে সে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে। তাই পুরনো ব্লেডে দাড়ি কামিয়ে অফিসের পথে বের হয়ে ট্রেনের ভেতরে নিখুঁত মসৃণভাবে দাড়ি কামানো যাত্রীদের দেখে হিরণ্য পরম অস্বস্তিতে ভোগে। এমনকি ট্রেনে যেতে যেতে সে যখন গোয়েন্দা কাহিনী পাঠে মন দেয় তখনও দেখতে পায় গোয়েন্দা কাহিনীর প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই ক্লীনশেভেন। ট্রেন থেকে নেমে ট্রামে উঠে যতগুলি মুখ হিরণ্য দেখতে পেয়েছে তারা প্রায় সকলেই পরিষ্কারভাবে দাড়ি কামিয়ে এসেছে। ইচ্ছে ছিল অফিস ছুটির পর শিখা ঘোষের সঙ্গে সে চা খাবে, ফুল কিনে দেবে শিখা ঘোষকে। কিন্তু ট্রামের ভেতরেই তার সবস্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় তারই কথায়

---

৬২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাপের মাথার মণি, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৬, এভারেস্ট হাউস, কলিকাতা - ৩৩, পৃষ্ঠা - ৭

ও ব্যবহারে । কন্ডাকটারের কথায় সে লেডিস সীট ছেড়ে দিয়, কিন্তু ভিড় ঠেলে মহিলা যাত্রীটির উঠে আসার কথা ভেবে সে কটু মন্তব্য করে । সেই যাত্রীটিই ছিল শিখা ঘোষ । গোটা গল্প জুড়েই হিরণ্য সোমের হীনমন্যতা বোধটি পরিস্কার ফুটে উঠেছে । ভোঁতা ব্লেডে দাড়ি কামানোর জন্যেই এই দুর্বলতা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে সে ।কাজেই ভোঁতা ব্লেড এখানে তার জীবনের ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে উঠেছে ।

'সাপের মাথার মণি' গল্পে ভালোবাসার ক্ষেত্রে ইতর প্রাণী ও মানুষে কোন তফাৎ নেই । সাপকে সবাই ভয় করে, কিন্তু সাপের মাথার মণির খোঁজ কেউ পায়না । খুকু পেয়েছিল সেই খোঁজ । অথচ পৃথিবী বারবার তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয় । এ গল্পে সাপের মণি আছে, তবু সে দংশন করে, অন্যদিকে মহীনেরও ডিগ্রী আছে তবু সে প্রতারণা করে । তবুও এই ভীতির মধ্য থেকে মানুষ সংগ্রহ করতে চায় সাপের মাথার মণি । খুকুর দেখা সাপটিকে সাপুড়ে এসে ধরে নিয়ে যাওয়ার তেরো বছর পর মহীনের মধ্যে সাপের মাথার মণির সন্ধান পেয়েছিল খুকু । কিন্তু সাপের মাথার মণি কিংবা মহীন কাউকে খুকু পায়নি । সাপেরমাথার মণি যেন দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ বস্তু হিসাবে খুকুর অপূর্ণ অতৃপ্ত ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছে এগল্পে ।

'অনুকল্প' গল্পে পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে পরোপকার করে নিজেকে বঞ্চিত রেখে সত্যেনদা কৃতজ্ঞতা দাবী করেননি । কিন্তু নিরঞ্জনের সাথে মাধবীর মিলনের ব্যবস্থা করে ট্যাকসিতে তুলে দেবার পর তার মনে হয়েছিল বিনয় মিত্রের কথা 'এমন একটা সময় আসে যখন কারো কাছে আশ্রয় চাই আপনার– চাই বিশ্রাম–।'[৬৩] এই কথাতেই সত্যেন তার অর্থহীন অবিশ্বাস্য উদারতার কথা ভেবে অসহায়তাবোধ করেছেন । এর পরে কেবলই তাঁর মনে হয়েছে, নিরঞ্জন তাঁকে ঠকিয়েছে,

---

৬৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাপের মাথার মণি, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৬,
এভারেস্ট হাউস, কলিকাতা -৩০, পৃষ্ঠা -৫৬

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। লক্ষ্মীর মতো প্রতিমা মাধবীকে তিনিই পেতে পারতেন। তাই মাধবীর বাবা ব্রজভূষণদত্তের কাছে ছুটে এসে তিনি তাদের পলায়নের খবর জানিয়েছেন। এ গল্পে নিরঞ্জন আর মাধবীর মিলনের আয়োজনই সত্যেনদার হৃদয়ের লুপ্ত বাসনার দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আসলে জীর্ণ দেহ নির্বোধ প্রায় নিরঞ্জনকে প্রতীক করে সত্যেনদা তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনেরই অর্থ রচনা করেছিলেন এইভাবে। প্রতীকধর্মী গল্প হিসাবে গল্পটি সার্থক।

'সিংহ' গল্পে সিংহ অমিত বিক্রমের প্রতীক। এ গল্পের অফিসের দীনতম কেরাণীর জীবন ছিল অবজ্ঞা ও ব্যর্থতায় ভরা। বাড়িতে স্ত্রীর কাছে কেবলই ভৎর্সনা ও অবজ্ঞা তার নিত্যদিনের উপহার। অফিসে সকলের চোখে সে নগণ্য কেরাণী। খুড়িমা ও মনয়দার শাসনে তার ছোটবেলা কেটেছে। এইরূপ পরিবেশে প্রচণ্ড হীনমন্যতায় আত্মদগ্ধ কেরাণী স্ত্রীর সাথে সার্কাস দেখতে এসে ছোট সাহেবের টাক ও ওভারকোট দেখে নার্ভাস হয়ে যায়। কিন্তু সার্কাসের আসরে সবশেষে সিংহের খেলা দেখে তার জীবনের সমস্ত দুর্বলতাকে চাপা দিতে ছোট সাহেব ও দর্শকবৃন্দের দৃষ্টির সামনেই সে সার্কাসের সিংহের গায়ে লাফিয়ে পড়ে দুহাতে কেশর চেপে ধরে। সিংহের প্রচণ্ড থাবায় সে মারাত্মকভাবে আহত হয়। কিন্তু লুপ্ত চেতনা নিয়ে সে আস্তিকার জঙ্গলে কেবলই সিংহ শিকার করতে থাকে। জীবনের সমস্ত হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হবার জন্যেই তার এই প্রয়াস। কাজেই অমিত বিক্রম সিংহের কেশর ছিঁড়ে নেওয়ার ব্যাপারটা তার দুর্বলতা ও হীনমন্যতা মোচনের প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে।

'নকল' গল্পে নকল আয়োজন কৃত্রিমতার প্রতীক। আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত মিলনের পরিবেশটি স্বাভাবিকতার প্রতীক। সুদেব ও ললিতার মধ্যে সব চেয়ে বড় পাওয়াটিকে পাওয়ার সুযোগ একদিন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এসেছিল। জ্যাঠামণি ও জেঠিমার কাছ থেকে পাওয়া এক পরিচ্ছন্ন সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তারা একটি নির্জন সন্ধ্যাকে সুন্দরভাবে উপভোগ করেছিল। পড়ন্ত রোদের বিকেল,

হাতির পায়ের পাতায় সুন্দরবনের অরণ্য মর্মর, পক্ষীর কলধ্বনি, নরম ঘাসের ভেতর পা ডুবিয়ে দুজনের পাশাপাশি হাঁটা, আঙুলে আঙুল জড়িয়ে বসা - তাদের দুজনের সহজ স্বাভাবিক সান্নিধ্যের ক্ষণটিকে উপভোগ্য করে তুলেছিল। দুজনের দুজনকে এতকাছে পাওয়া তাই সার্থক। অথচ অন্যদিন ঠিক এইরকম আরেকটি সুযোগ নতুন করে কৃত্রিমভাবে পাওয়ার মধ্যে কোনো আনন্দ ছিল না। নগ্ন নির্লজ্জভাবের সেই সুযোগটিকে সংগ্রহ করার ব্যাপারটি কুশ্রী উদ্যমের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

'চায়ের বিকেল' গল্পে বাধা মাইনের চাকরী, মেসের জীবন, দেশে রেখে আসা মা বাবা - স্ত্রী - পুত্র - কন্যা পরিবৃত সংসার এই সব নিয়ে অমিতাভ তার হাঁপিয়ে ওঠা জীবনে একটি পরিচ্ছন্ন চায়ের বিকেল উপভোগ করতে এসেছিল বন্ধু মনোজের বাড়িতে। সেখানে মনোজ আর কেতকীর বিয়ের ছবি, কাঁচের আলমারিতে সাজানো পুতুল, দরজার রঙিন পর্দা, কেতকীর প্রসাধনের সুরভি মাখা স্বপ্নমদির সুসজ্জিত বেশবাস, মিষ্টি দাম্পত্য জীবন, চায়ের টেবিলে পরিবেশিত মাখন মাখানো টোস্ট ও অমলেট — এটি সুন্দর চায়ের বিকেলের প্রতীক হিসাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুন্দর চায়ের বিকেল শুধু স্বপ্ন ও কল্পনার বিষয়। অমিতাভ যখন মনোজের বাড়িতে একটি চায়ের বিকেলকে সন্ধ্যার খুশিতে ঝলমল করে তুলতে চেয়েছে তখনই কেতকী ওভারটাইমের প্রসঙ্গ তুলে মনোজ অফিস ছুটির পরে মেয়েদের সাথে কাজ করে কিনা সেকথা অমিতাভর কাছে জানতে চেয়েছে। কেতকীর এই সন্দেহ চায়ের বিকেলের একটি পরিপূর্ণ আয়োজনকে মুহূর্তে ম্লান করে দেয়। কেতকীর কদর্য প্রশ্নে সে বুঝতে পারে - মনোজের জীবনেও শান্তি নেই। তুলনায় তার নিজের জীবনকেই সে ভালো মনে করেছে। এ গল্পে চায়ের বিকেল সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রতীক হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু মনোজের প্রতি কেতকীর সন্দেহ কুশ্রীতার প্রতীক হিসাবে ধরা পড়েছে। এর মধ্য দিয়ে নগর কলকাতার দাম্পত্যজীবনে সন্দিগ্ধমনা স্ত্রীর পরিচয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মানুষের স্থূলরুচি, বিকৃতজীবনযাত্রা, লোভ, মোহ, স্বার্থপরতাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয় ব্যঙ্গাত্মক গল্পে। সমকালীন সমাজের অসঙ্গতি ও বিকারগ্রস্ত জীবনের চিত্র এই ধরণের গল্পে প্রাধান্য পায়। "ব্যঙ্গাত্মক গল্প প্রধানত সামাজিক রাজনৈতিক ও যৌন সমস্যাকে আশ্রয় করে ক্ষুরধার বক্রহাসিতে আত্মপ্রকাশ করে।' [৬৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে সমাজ জীবনের বিকৃতিকে ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এই গল্পগুলোকে অবশ্য সমাজ সমস্যামূলক গল্পের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। ব্যঙ্গাত্মক গল্পগুলির মধ্যে 'টোপ', 'ছলনাময়ী', 'একটি শত্রুর কাহিনী', "শেয়া', কালনেমি' 'একটি কৌতুক নাট্য', 'ধূনী', 'ইদ্দ মিঞার মোরগ', 'একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা' প্রভৃতি।

'টোপ' গল্পে টেরাই এর রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর তাঁর শিকারেরহিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই আদিম হিংস্রতার বলি হয়েছে হান্টিং বাংলোর হিন্দুস্থানী কীপারের বেওয়ারিশ শিশু। উদ্ভট আনন্দ উপভোগের বীভৎস রূপটি রাজাবাহাদুরের হিংস্র চরিত্রের মুখোসটিকে টেনে খুলে দিয়েছে। মানব শিশুর টোপ দিয়ে বাঘ শিকারের মধ্য দিয়ে মানবতার চরম অপমানের লোমহর্ষক চিত্রটি প্রচ্ছন্নব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে 'টোপ' গল্পে লেখক প্রকাশ করতে পেরেছেন।

'ছলনাময়ী' গল্পে ছলনাময়ী নারীই কাপালিক ভৈরবানন্দ ও সন্ন্যাসী ভূমানন্দকে সংসার ত্যাগী করে দক্ষিণ কলকাতার শ্মশানে টেনে এনেছে। কিন্তু একরাতে বহুদিনের উপবাসী কামনা নিয়ে তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ শ্মশানে আবির্ভূতা ভৈরবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ভূমানন্দ ভৈরবানন্দকে আক্রমণ করে ; আর দুজনের খুনোখুনি রক্তপরিচ্ছিন্ন অবসরে সুযোগ বুঝে ভৈরবী পালিয়ে যায়। তন্ত্রসাধক ও সন্ন্যাসীবেশী ভৈরবানন্দ ও ভূমানন্দের এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তথাকথিত ভণ্ড তান্ত্রিক ও সন্ন্যাসীদের প্রতি তীব্রব্যঙ্গ 'ছলনাময়ী' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে।

---

৬৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: সাহিত্যে ছোটগল্প, শ্রাবণ ১৩৮৪, ৫ম সংস্করণ, ডি. এম লাইব্রেরী, কলি-৬, পৃষ্ঠা-৬২২

'একটি শত্রুর কাহিনী' গল্পে ম্যাক্স্ মূলারের কাহিনী পড়ে তরুণ জার্মান পাদ্রী হ্যানস ভারতবর্ষকে সত্যিই ভালো বেসেছিল, অথচ পাদ্রী ভোলান্তম সারা জীবন চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। ভোডা সাঁওতাল ও নাম পরিবর্তন করে জোসেফ ইম্যানুয়েল নামে পরিচিত হয়েছিল, কিন্তু হ্যানসের ভারতপ্রীতি ছিল তার কাছে অসহ্য। কাজেই হ্যানস যখন সহজেই ভারতবাসীর মন কেড়ে নিল তখন সেইটিই হল তার অপরাধ। কেননা পুতুল পুজোর দেশ এই ভারতবর্ষে খ্রিশ্চিয়ানিটি আর ইয়োরোপের মর্যাদাকে হ্যানস মাটি করেছে। কাজেই সে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শত্রু। খ্রিশ্চিয়ানিটির আদর্শ নষ্ট করার অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সে গ্রেপ্তার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পক্ষে ইংরেজের যুদ্ধ জয়ের জন্যে কালীপুজোর আয়োজন দেখে ফ্লাস্ক ছুড়ে মেরে কালীমূর্তির মাথা গুড়ো করে দিয়ে সে নিজেকে একজন খাঁটি শত্রুতে পরিণত করেছে। ইংরেজরা পুতুল পুজোর বিরোধী, কিন্তু যুদ্ধ জয়ের জন তারাই আবার কালীপুজোর আয়োজন করেন। এইটি হ্যানসের কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। এই কারণে যে হ্যানস গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশত, ছেলেদের ভালোবাসত এমনকি শিবের গাজনে নেচে গান গাইত সেই যখন কালীমূর্তির মাথায় ফ্লাস্ক ছুড়ে মারে তখন তার এই অদ্ভুত আচরণ সকলকে অবাক করলেও এরই মধ্যদিয়ে তথাকথিত খ্রিশ্চিয়ানিটির অন্তঃসারশূন্যতার চিত্রই ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ গল্পে পৌত্তলিকতার দেশ এই ভারতে খ্রিশ্চিয়ানিটির প্রচারকদের মুখোসটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। কারণ মুখে তারা পৌত্তলিকতা বিরোধী, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কালীপুজোর আয়োজন করে যুদ্ধ জয়ের অভিলাষে। 'একটি শত্রুর কাহিনী'তে তাই হ্যানস শত্রু না হয়েও শত্রু। একটা দেশকে ভালোবেসে সে দেশের মাটি, মানুষ ও ধর্মসংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা অনেক শত্রুতার নামান্তর।

'শৈব্যা' গল্পে ধার্মিক, চরিত্রবান বলে খ্যাত রাধাকান্ত বৈঠকখানায় বসে নারীজাতীর পাপপ্রবণতা সম্পর্কে আলোচনা করেন, 'হিতোপদেশের' দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে নারীজাতির প্রতি কলঙ্ক লেপন করে দেন, কিন্তু পত্নী-পুত্র-কন্যা পরিবৃত সংসারে তাঁরই বাড়িতে আশ্রিতা বালবিধবা জাতির মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে সন্তান সম্ভবা করে তুলতে তার দ্বিধা হয়না। সমাজের চোখে জাতির মেয়ের কাছ থেকে বংশধর কামনা করা অন্যায় বলে তিনি নীরদাকে কাশীতে রেখে আসেন। কাশীতে নির্বাসিতা নীরদার নারীত্ব পদে পদে অপমানিত হতে থাকে, কিন্তু রাধাকান্তর বাড়িতে কথকতার আসরে হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার পালা ঠিকই জমে ওঠে। সাধু ও চরিত্রবানের নামাবলি গায়ে চাপিয়ে রাধাকান্ত লোকসম্মুখে সৎ ও পুণ্যবান হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরই গোপন কৃতকর্মের জন্যে তাঁর চরিত্রে যে কালিমা লিপ্ত হয়েছে শৈব্যা গল্পে তীব্র ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে লেখক তা প্রকাশ করেছেন।

'কালনেমি' গল্পে স্বাধীনতালাভের পর ভারতে চায়ের ব্যবসা যখন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তখন জনস্টন ও অ্যাক্রেল সাহেব কৌশলে ধনরাজ গুরুংকে হাত করে বাঙালীবাবুদের ওপর আক্রমণ করার পথ দেখায়। ধনরাজের নেতৃত্বে কুলীরা বাঙালীবাবুদের আক্রমণ করল ঠিকই, কিন্তু সেই ধনরাজ গুরুং যখন মাতলামির ঝোঁকে উত্তেজিত কুলীর দলকে নিয়ে অ্যাক্রেলের বাংলো দখল করে নেয় তখন বাঙালী বাবুদের হেনেস্তা করার পরিণাম অ্যাক্রেলো হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যায়। কালনেমি গল্পটির নাম করণের মধ্যেও আছে ব্যঙ্গের সুর, তাই ব্যঙ্গাত্মক গল্প হিসাবে কালনেমি সার্থক গল্প।

'একটি কৌতুক নাট্য' গল্পে ঘারচুরির অপরাধে একজন নিরপরাধ মানুষকে সন্দেহ করে প্রচণ্ড প্রহার করা হয় এবং কথা আদায় করবার জন্যে তাকে এক থালা সন্দেশ খেতে দিয়ে প্রচণ্ড জল পিপাসার মধ্যেও জল দেওয়া হয়নি। ফলে অপরাধী না হয়েও লোকটি চুরির দায় নিজেই স্বীকার করে নেয়।

আসলে বাড়ির ছেলে খোকন হারটি চুরি করে স্যাকরার কাছে বিক্রী করেছিল, স্যাকরা নিজে এসে একথা খোকনের বাবাকে জানায়। খোকনের বাবা ছেলের এই অপরাধ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু লোক সম্মুখে ছেলের এই অপরাধকে আড়াল করার জন্যে তিনি এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সুতরাং ব্যঙ্গাত্মক গল্প হিসাবে গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

'সোনালী বাঘ' গল্পে সোনাবুরি চা বাগানের ম্যানেজার মোহিনী সরকার মুখ, দুর্ভিক্ষ আর চরম বস্ত্র সংকটের দিনে কুলীদের বঞ্চিত করে কেবল চালডালই আত্মসাৎ করে না, তিনশো বস্তা চা গোপনে সরিয়ে রাখতেও তার দ্বিধা নেই। বাগানে বাঘের অত্যাচার হয়, কুলী মংরোকে খাটিয়া থেকে বাঘ এসে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই বাঘ মোহিনী সরকারের ঘরেও। সেই বাঘ অবশ্য চতুষ্পদ নয়, মানুষ। কারণ মোহিনী বাড়ি এসে দেখে এরোড্রামের আমন্ত্রিত শিখী তারই স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে দরজা দিয়েছে এবং তারই আশ্রিতা আয়ার ঘরে ঢুকেছে পাঞ্জাবী। লোভী, স্বার্থপর মোহিনীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যঙ্গচিত্রটিই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে এইভাবে।

'খুনী' গল্পে খুনী আসলে নেভেল ক্যাম্পের পুতিহারী হাজারী নয়, রাত দেড়টায় পুতিহারীর ঘরে আশ্রিতা মাতাল চ্যাটার্জী, ঘোষ ও মাইতি নামে তিন বাঙালীবাবু। মুখে কর্তব্যের প্রতি অবহেলা ও ক্যাপ্টেনের বিরোধিতা, দেশপ্রীতি আর গণসংযোগের বুলি আওড়ানো কেবল তাদের মিথ্যে ভাষণেরই পরিচয় বহন করে। আসলে তারাই আদর্শভ্রষ্ট। তাদেরই প্ররোচনায় সেইরাতে হাজারী মদের নেশায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল এবং সেই ফাঁকে গেট খোলা পেয়ে গরুর গাড়ি লাইনে উঠে পড়ে আর মেল ট্রেন এসে গাড়োয়ান ও গাড়িকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে যায়। তীব্র যন্ত্রণায় বলদ দুটিও রেললাইনের ধারে পড়ে কাতরাতে থাকে। বীভৎস এই খুনের দৃশ্য দেখে নিজেকে খুনী মনে করে হাজারী রক্তমাখা ছড়ানো লাইনে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে খুনী হাজারী নয়, এই খুনের কারণ ছিল ভদ্রবেশী তিন বাঙালীবাবুই, খুনী তারাই।

ভদ্রবেশী বাঙালীবাবুদের চারিত্রিক স্বরূপ প্রকাশের মধ্য দিয়ে এ গল্পের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'ইদ্‌মিঞার মোরগ' ব্যঙ্গাত্মক গল্প। এ গল্পে ইদ্‌মিঞার প্রিয় মোরগটিকে খাবার লোভ কার না ছিল! দবিরুদ্দিন দফাদার, দারোগা দীন মহম্মদ, ইনস্পেকটার ইমতিয়াজ চৌধুরী মোরগটির জন্যে দুরন্ত লোভ করে, কিন্তু কারো ভাগ্যেই তার সেটি জোটেনি। ইমতিয়াজ চৌধুরীর গাড়ি থেকে সেটি পালিয়ে আবার ইদ্‌মিঞার কাছেই চলে আসে।

'একটি চলচ্চিত্রের ভূমিকা' গল্পেও ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়েছে। কলকাতার বস্তিবাসী মানুষের দুরবস্থা দূর করবেন নিত্যানন্দ চৌধুরী। গরীবদের প্রতি করুণা ও সমবেদনাভূতিতে তাঁর আত্মা বেদনায় জর্জরিত। কিন্তু তাঁরই নিজের টালীগঞ্জের বস্তি থেকে তিনি অজস্র মানুষকে তুলে দিয়েছেন। পরিবর্তে পাঁচ লাখ টাকা ব্যয় করে সেখানে খুলবেন স্টুডিয়ো। তাই 'দুঃখী দুনিয়া' নামে সিনেমার গল্প লিখিয়ে নিতে চান গল্পের বক্তাকে দিয়ে। ধনীদের অত্যাচারের কাহিনী তাতে থাকবে। তাঁর এই গরীব প্রীতি সত্যিই ব্যঙ্গের উপযুক্ত। গল্পের বক্তাও ভেবেছেন যে তার জন্যে গল্প লিখে দেবার প্রয়োজন নেই, কারণ দুর্ভিক্ষ এলে তিনি রাস্তা থেকেই ছবি তুলে নিতে পারবেন।

বিষয়বস্তুর বিচারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু কিছু গল্পকে স্নেহ প্রীতিমূলক গল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এই শ্রেণীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল।

'রাঙামাসিমা' গল্পটির আকর্ষণ গল্পের স্নেহপ্রীতিমূলক পরিবেশের জন্যেই। ছেলেবেলায় রাঙামাসিমা গল্পের বক্তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, 'বিরাট থালায় সাজিয়ে দিতেন ঘিয়ে ভেজানো সুগন্ধি চালের গরম ভাত, পাঁচ রকম ভাজা, আট দশটা বাটিতে মাছ - তরকারী মিষ্টি পায়েস। খেয়ে বলতেন,

বছরের এই দিনটিতে ওকে খাইয়ে বড় তৃপ্তি পাই আমি । আমি যে ওর ভিক্ষে - মা - উপনয়নের পরে আমিইতো ওকে প্রথম ব্রত ভিক্ষে দিয়েছি ।'[65] পরবর্তীতে বারো বছরের সময় যখন বড়খো টাইফয়েডে মরণাপন্ন তখন এই রাঙামামিমাই বুক চিরে রক্ত-রাঙা বেলপাতা দিয়ে অঞ্জলি দিয়েছিলেন কালী বাড়িতে । অথচ তাঁরই ছেলের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে পনের টাকা আর্থিক সাহায্য সে দিতে পারেনি । কারণ দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে শিক্ষকতা , টিউশনি করে তার দিন চলে না , সেলাই করা কাপড় পরে অপুষ্টিতে ভোগে তার স্ত্রী । তথাপি রাঙামামিমার স্নেহের কথা ভেবে প্রতিদানে সে কিছুই করতে পারেনি বলে তার অন্তর ব্যথিত হয়েছে । স্নেহপ্রীতিমূলক গল্প হিসাবে তাই 'রাঙামামিমা' গল্পটি উল্লেখযোগ্য ।

'প্রদীপ ও প্রজাপতি' গল্পের টুনু বৌদি ও সোনা পিসীমার সাথে রঞ্জনের স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক ছিল । ছেলেবেলায় সোনাপিসীমার বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল । সোনা পিসীমার হাতের চিঁড়ের মোয়া ছিল তারকাছে এক বড় আকর্ষণ । কিন্তু পরিণত বয়সে সোনা পিসীমার বাড়িতে এসে অসুস্থ পিসীমার মুখে মৃত্যুপাণ্ডুরতার আভাস , টুনু বৌদির হতাশাযুক্ত জীবনের দৃশ্য রঞ্জন ব্যথিত হয়েছে । সোনা পিসীমার মৃত্যুর পর টুনু বৌদি ও বঙ্কুদার কলকাতার বিপন্ন অসহায় জীবন যাপনের মধ্যে নাগরিক জীবনযাত্রার বিবর্ণতা প্রতিফলিত হলেও এ গল্পের সোনা পিসীমা , টুনু বৌদি ও বঙ্কুদার সাথে রঞ্জনের স্নেহের সম্পর্ক গল্পটিকে স্নেহপ্রীতির উপাদানে ভরিয়ে দিয়েছে ।

'টুটুল' গল্পে কলকাতা থেকে দুশো মাইল দূরে মা টুটুলকে মিশনারি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে চলে এসেছিলেন । কিন্তু মায়ের কথা মনে করে টুটুল শেষ পর্যন্ত অনেক অনেক পথ পায়ে হেঁটে ফিরে আসে মায়ের কাছেই । এ গল্পটিও স্নেহপ্রীতিমূলক ।

৬৫.নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -১১(গল্প , রাঙামামিমা), ফাল্গুন ১৩৯৪, ১ম প্রকাশ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , পৃষ্ঠা - ২৪৫

'দায়' গল্পে যে অঙ্কের মাস্টারমশাই স্কুলজীবনে সুকুমারের কাছে বিভীষিকা হলেও পরিণত বয়সে তাঁকে নিয়ে গল্পলেখার মধ্যদিয়ে মাস্টারমশাইর প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে। অন্যদিকে মাস্টারমশাইও সুকুমারের লেখা গল্পটির জন্যে গর্ব প্রকাশ করে জামার পকেটে সেই গল্পটি বয়ে বেড়াতেন এবং যার সঙ্গে দেখা হত তাকেই তিনি দেখাতেন গল্পটি। বাংলাদেশের এক কলেজে সুকুমার এসেছিল বক্তৃতা দিতে। মাস্টারমশাই সেখানে ছুটে যান। বক্তৃতার শেষে সুকুমারের সাথে দেখা করেন। সুকুমারের সঙ্গে কথা বলবার সময় আনন্দের আতিশয্যে মাস্টারমশাইয়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। স্নেহ, প্রেম ও দয়ার মহাসমুদ্র ছিলেন মাস্টারমশাই। অথচ সুকুমার তাঁর এই স্নেহের দাম দিতে পারেনি। মাস্টারমশাইকে নিয়ে করমায়েশী গল্প লিখে দশটাকার বিনিময়ে সেটিকে বিক্রী করে সে তাঁর স্নেহ ও প্রেমের অবমাননা করেছে। শিক্ষক ও ছাত্রের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কের নিদর্শন স্বরূপ এই গল্পটির মূল্য কোন অংশে কম নয়।

'পুরনো' গল্পের সুধাময়ের শিশুসুলভ আচরণ, ছেলেমেয়েদের নিয়ে মায়ের কাছ থেকে রূপকথার রত্নমালার গল্প শোনা ও অসুস্থ শরীরে মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্যে বয়সের ব্যবধান ঘুচে মা-ও ছেলের মধ্যগত স্নেহের সম্পর্কটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গল্পটি স্নেহপ্রীতিমূলক।

'ভাটিয়ালী' আর একটি স্নেহপ্রীতিমূলক গল্প। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে নিখোঁজ অশোক একদিন মায়ের কাছে ফিরে আসে। শশী ভট্টাচার্য্যের মেয়ে সুধার সঙ্গে মা দিতে চান অশোকের বিয়ে। অশোকও স্থির করে মায়ের কাছেই সে থাকবে। কিন্তু শেষ রাতে পুলিশ এসে আবার ধরে নিয়ে যায় অশোককে। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অশোকচলে যায়। হারানো ছেলেকে এতকাল পরে কাছে পেয়েও মা ধরে রাখতে পারলেন না। মাতৃস্নেহ ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা একসঙ্গে মিলিত হয়ে গল্পটি সার্থক।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্নেহপ্রীতিমূলক গল্পের আরেকটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'অনুখলিফার শেষ খুন' গল্পটি। অনুখলিফা খুনী, শয়তান। তার চকচকে ভোজালীতে সে সাতটি খুন করেছে, জেল খেটেছে পাঁচবার। কিন্তু খুন ছেড়ে দিয়ে অনুখলিফা ভালো হতে চেয়েছিল। তাই লক্ষ্ণৌ নয়, কলকাতা উত্তরবাংলার এক নিভৃত পল্লীতে এসে সে কসাই হিসাবে মাংসের দোকান খোলে। কিন্তু সত্যনারায়ণ হালুইয়ার পাঁচ বছরের মেয়ে রামদুলারীর সঙ্গে তার স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রামদুলারী এলেই তার হাতে কলাপাতায় করে সে মাংসের মেটে তুলে দিত। রামদুলারীকে তার ভালো লাগে, এই দাক্ষিণ্যটুকু প্রকাশ করে সে আনন্দ পেত। 'বাংলাদেশের মাটিতে পা দিয়ে বাংলার স্নেহ-স্নিগ্ধ কোমলতা তার চেতনায় মায়া ছড়িয়েছে।'[৬৬] তাই মাঝে মাঝে তার মনে হত, রামদুলারীর মতো একটি মেয়ে যদি তার থাকত তাহলে সে কত খুশী হত। কিন্তু খুনী থেকে স্নেহপ্রবণ মানুষে পরিণত অনুখলিফা যখন দেখেছে দুর্ভিক্ষের দিনে মানুষের দুর্ব্যবহারে ভারী অসুখে ভুগে ওষুধ আর ভাতের অভাবে তার রামদুলারী না খেয়ে মরেছে তখন আবার পুরনো খুনের নেশায় সে মত্ত হয়ে ওঠে। সে খুঁজে বের করতে চায় কে তার স্নেহের রামদুলারীকে হত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত সে চালের চোরা কারবারী বংশধরকে অপরাধী মনে করে ভোজালি দিয়ে বংশীধরের পেট ফালাফালা করে কাটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে আফগানিস্থানের মরুবাসী কাবুলিওয়ালার সঙ্গে কলকাতার ভদ্র পরিবারের পাঁচ বছরের বালিকা মিনির স্নেহের সম্পর্ক দেখিয়েছেন, আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন তাঁর 'অনুখলিফার শেষ খুন' গল্পে। লক্ষ্ণৌ শহরে একদা দুর্দান্ত গুণ্ডা অনুখলিফা উত্তর বাংলার নিভৃত পল্লীতে বাস করবার সময়ে পাঁচ বছরের বালিকা রামদুলারীর সাথে স্নেহের বন্ধন স্থাপন করে। রহমত ও অনুখলিফা দুজনেই প্রবাসী, দুজনেই খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে

- -

৬৬. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সুনির্বাচিত গল্প, কার্তিক, ১৩৬১, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, পাবলিশিং কোং লি, কলিঃ, পৃষ্ঠা -১৬০

ও জেন খেটেছে । আবার স্নেহপরায়ণতার গুণে দুজনেই সমগোত্রীয় । রহমত মিনিকে ভালোবেসে পেস্তা বাদাম দিত , আর আলুরামদুলারীর হাতে তুলে দিত ঘাসের মেটে ।

এছাড়া 'দুর্নর্ম্য' গল্পের ছোটভাই হরেন্দ্রের প্রতি বড় ভাই রাজেন্দ্রের স্নেহ ও প্রীতি ,'মর্যাদা' গল্পের পণ্ডিত মশাইয়ের ছাত্রের প্রতি স্নেহ গল্পদুটিকে স্নেহ - প্রীতির উপাদানে ভরিয়ে দিয়েছে ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' ও 'দোসর' গল্পে পশু মনস্তত্ত্বের দিকটি বিশ্লেষিত হয়েছে । এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' এবং তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' গল্পে পশুর সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' ও 'দোসর' গল্পে পশু ও মানুষের আত্মিক যোগাযোগের সন্ধান মেলে ।

'সৈনিক' গল্পে বরেন্দ্রভূমির কুমারদহ গ্রামের দেবীকোট রাজবংশের উত্তরপুরুষ চন্দ্র চৌধুরী হাতিনীলবাহাদুরকে একদিন আসামের জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে আসেন । জমিদার চন্দ্রচৌধুরীর নামের সাথে এই নীলবাহাদুরের নাম অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা । চন্দ্র চৌধুরীর স্নেহচ্ছায়ায় শাল গ্রামের টিলায় সাঁওতালেরা এসে বাসা বেঁধেছিল । তাই নীলবাহাদুরকে নিয়ে জমিদার যখন শাল গাঁয়ের টিলায় আসতেন তখন সাঁওতালেরা শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় জমিদারের প্রতিই কেবল আনুগত্য প্রকাশ করেনি , নীল বাহাদুরকেও তারা অন্তর দিয়ে ভালোবাসত । শিশু , বালক ও মেয়ের দল তার চার পাশে ঘিরে দাঁড়াত । কলা , মহুলা , ভুট্টা খেতে দিত । লোকালয়েও আরণ্যক মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা পেয়ে আনন্দ তৃপ্তিতে নীলবাহাদুরের মুদে চোখ বুজে আসত । কিন্ত চন্দ্রচৌধুরীর মৃত্যুর পর হাঁড়িয়াসের এম.এ পুত্র ইন্দু চৌধুরীর আমলে তার প্রতি হল চরম অবহেলা । নীলবাহাদুর নয় , নতুন যুগের মোটর বেবি অস্টিনই ছিল ইন্দু চৌধুরীর বাহন । তাই নীলবাহাদুরকে পিলখানায় বন্দি জীবন কাটাতে হয় । নীলবাহাদুরকে কাজে না লাগালেও একদিন ইন্দু চৌধুরীর মনে মনে পরিকল্পনা

করেন, সাঁওতালদের উচ্ছেদ করে পাল গাঁয়ের টিলা খুঁড়ে আবিষ্কার করবেন পুরাতাত্ত্বিক উপাদান। তাঁরই নির্দেশে নীলবাহাদুরকে তিনদিন অনাহারে রেখে ছেড়ে দেওয়া হল পাল গাঁয়ের টিলায় সাঁওতালদের ধানের ক্ষেতে। অনাহারক্লিষ্ট নীলবাহাদুরের মধ্যে জেগে ওঠে হিংস্র পাশবিকতা। সাঁওতালদের পাকা ফসলকে দলিত মথিত করে সে নষ্ট করে দিল। সাঁওতালেরা ও তীরের ফলায় তার জবাব দিল। বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়ে নীলবাহাদুর প্রাণ হারান, কিন্তু মরবার পূর্বে তার প্রকাণ্ড দেহের চাপে গুঁড়ো হয়ে যায় ইন্দুচৌধুরীর বেবি - অস্টিন। ইন্দু চৌধুরীর আমলে বেবি অস্টিন নীলবাহাদুরের স্থান দখল করে নিয়েছিল, মৃত্যুর পূর্বে নীলবাহাদুর তার প্রতিশোধ নেয়। পশু মনস্তত্ত্বমূলক গল্প হিসাবে এ গল্প সার্থক।

'দোসর' গল্পে এক উদ্বাস্তু ভদ্রলোকের জীবনে দোসর হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল একটি শূয়োর। দেশছাড়া হয়ে বউ ছেলেমেয়ে হারিয়ে উদ্বাস্তু ভদ্রলোক প্রথমে এসে বাসা বাঁধেন আসামের পাহাড়ের ঢালে। সেখানে বাস্তু বেঁধে তিনি সোনা ফলিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমে সরকারী নোটিশ পরে হাতি লেলিয়ে দিয়ে ঘরদোর ভেঙে তাঁকে উৎখাত করা হয়েছিল। তারপর বাংলাদেশে এসে পাহাড়ী নদীর চড়ায় কাশ, শন আর ইকড়ার জঙ্গল ভেঙে শাক সব্জি আবাদ করলেন তিনি। সেখানেও আবির্ভাব হল বুনো শূয়োরের। কিন্তু শত্রুরূপে নয়, দোসর রূপে। নির্জন ভূতুড়ে চড়ায় ভদ্রলোক যেমন একা তেমনি শূয়োরটিও। ফলে জ্যোৎস্না রাতে কিংবা অন্ধকার রাতে আলো আঁধারের মধ্যে শূয়োরটি এসে দাঁড়াত ভদ্রলোকের কাছে। শহর থেকে তিনজন লোক এসে শূয়োরটিকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভদ্রলোক তাকে কৌশলে বাঁচিয়ে রাখেন। শূয়োরটি রক্ষা পেলেও অসন্তুষ্ট ভদ্রলোকেরা খাস জমিতে বে-আইনি আবাদের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে নোটিশ করায়। কিন্তু উচ্ছেদের পূর্বেই পাহাড়ী নদীর বানের জলে ভদ্রলোক ও শূয়োর ভেসে গেলেন। কিন্তু চরম বিপদের সময়ে শূয়োরটি মূর্ছিত ভদ্রলোককে ডাঙায় টেনে এনে ফেলে রেখে, ভেসে যায়। পশু হওয়া

সত্ত্বেও বিপন্ন মুহূর্তে শূয়োরটিই ভদ্রলোককে বাঁচিয়েছিল । মানুষের সাথে পশুর বন্ধন স্থাপনের এর চাইতে মহৎ দৃষ্টান্ত আর কীই বা হতে পারে ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমকালীন রাজনৈতিক জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ করেছেন । ব্রিটিশ শাসিত ভারতের মুক্তি আন্দোলন, আগষ্ট বিপ্লব, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন । দেখেছেন রাজনৈতিক আদর্শপুরণ মানুষকে, উপলব্ধি করেছেন আদর্শ ভ্রষ্টতার রূপকে । তাই তার কিছু কিছু ছোটগল্পে এর প্রভাব পড়েছে । তাঁর রাজনীতি এবং আদর্শ নির্ভর ছোটগল্প-গুলিকে আদর্শাত্মক, রাজনৈতিক গল্প হিসাবে চিহ্নিত করা যায় । নিম্নে এই ধরণের গল্পগুলির বিশিষ্টতা আলোচনা করছি ।

'চারতলা' গল্পে পরাধীন ভারতে বাংলা দেশের সংবাদপত্র জগতে মহাবিপ্লবের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল 'অগ্নিহোত্রী' পত্রিকা । একদিন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে শশধর, শ্যামানন্দ, শ্রীপতি, অজয় প্রাণপাত চেষ্টা করেছে, পত্রিকার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে বস্তির খোলা ঘরে মুখে রক্ত তুলে বিনা ওষুধে প্রবীর মরেছে । দেশের শ্রমিক, মজুর, কুলি, কেরাণী আর নির্যাতিত লাঞ্ছিত মানুষ অগ্নিহোত্রী পত্রিকাকে অন্তর দিয়ে ভালোবেসে অর্থ সাহায্য করেছেন নানাভাবে । কেউ দিয়েছে দু, কেউ পাঁচ আনি সোনার আংটি । কিন্তু পত্রিকার সম্পাদক নিরঞ্জন চ্যাটার্জী তাদের দানের কোন মূল্য দিতে জানে নি । পত্রিকার শত্রু, দেশের শত্রু ধনকুবেরের জয়ঢাক পিটিয়ে লক্ষ লাখ টাকার মালিক হয়েছে । লোভ ও স্বার্থপরতাকেই বড় করে তুলে সে আদর্শ বিহীন অকৃতজ্ঞ মানুষে পরিণত হয়েছে । অগ্নিহোত্রীর বিপ্লবী আদর্শ সে মাটি করে দেয় । দু'বার বি.এ. ফেল করে দশ টাকার প্রাইভেট টিউশনি খুঁজে বেড়িয়ে যে নিরঞ্জনের দিন কাটত অগ্নিহোত্রী পত্রিকাকে বিপথগামী করে সে বড়লোক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দেশের মানুষের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে সে অগ্নিহোত্রীকে দেশদ্রোহীতে পরিণত করেছে । রাজনৈতিক ও আদর্শাত্মক গল্প হিসাবে গল্পটি সার্থক ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' একটি অসাধারণ গল্প । ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় গল্পটি লেখা। ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলন, কংগ্রেসের কন্ঠরোধ এবং নেতৃহীন দেশের বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে সারা দেশে জ্বলে আগুন, ঝরে রক্ত । এমন পরিস্থিতিতে অনেকের মতো অমরেশের পুত্র লোকেশ প্রাণ দেবে । নবদ আইন অমান্য আন্দোলন, বোমার যুগে 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' এর পথ ভেঙে সে এগিয়ে যাবে । হয়েছেও তাই । বৃহত্তর পৃথিবীর আহ্বানে বুলেট বিদ্ধ হয়ে লোকেশ পুত্রপিতা দেশমাতার অপমানের গন্ডী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। তার অকাল মৃত্যুতে পিতা অমরেশের সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে । কিন্তু মর্মান্তিক পুত্র শোকের মধ্যেও অমরেশ ভেঙে পড়লেন না । বাংলাদেশের ইতিহাস লিখছেন তিনি । লিখেই গেলেন । সেখানে পুত্রশোক বড় নয়, একটি অবক্ষয় মাত্র ।" বারে বারে এমনি অবক্ষয়ের মধ্য আমরা পদচিহ্ন এঁকে যাই — আমাদের রক্তাক্ত পদলেখা জ্বলজ্বল করে জালিয়ান ওয়ালায়, সেবাগ্রামে কর্ণফুলীর তীরে, বুড়ী বালামের অরণ্যে, মেদিনীপুরের রাঙামাটিতে । ভাবীকালের পথ নির্দেশ সেই রক্তলিপিতে ।"৬৭ তাঁর সেই ইতিহাসের কাহিনীতে —"অতীতের কঙ্কালাকীর্ণ শ্মশানের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট প্রদোষালোকে এগিয়ে আসছে দলে দলে ছায়ামূর্তি - পৌন্ড্রবর্ধন থেকে, মহাস্থান থেকে, তাম্রলিপ্তির সমুদ্রতট থেকে, পদ্মার পরপারে বিক্রমপুরের ভোজবর্ম দেবের রাজধানী থেকে । সেই সৈনিকদের দলে লোকেশকেও চেনা যায় ।"৬৮ তাই ইতিহাস গল্পে অমরেশের পুত্রশোক, লোকেশের মৃত্যুতে কোন প্রণতির কান্না কিংবা মেদিনীপুরের বন্যা মহামারী প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, কারণ ইতিহাস লেখক অমরেশের বিশ্বাস, হিমাদ্রেমেভরা বাংলা আবার প্রাণ পাবে, নতুনশক্তিতে জাগবে, অনুপ্রাণিত হবে নতুন প্রেরণায় । সেদিন বাংলার আকাশে উদিতহবে

- -

৬৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -৩(গল্প - ইতিহাস), শ্রাবণ, ১৩৮৯, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি -৭৩, পৃষ্ঠা-৩০৪

৬৮. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী-৩(গল্প -ইতিহাস), শ্রাবণ, ১৩৮৯, ২য় মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি - ৭৩, পৃষ্ঠা - ৩০৬

স্বাধীনতার সূর্য। চরম সর্বনাশের পটভূমিতে লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা পারস্পরিক হানাহানি। আর সর্বগ্রাসী মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে হাতে হাতে রাখী বেঁধে দেশের মানুষ প্রতিষ্ঠা করবে এক সর্বজনীন ঐক্য। দেশেদেশে ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। দেশাত্মবোধ, রাজনৈতিক আদর্শ আর ইতিহাসের সংমিশ্রণে এ গল্পটি সত্যিই অনন্যসাধারণ।

আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা 'অপঘাত' গল্পটি। গল্পটিতে আদর্শহীনতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বেথুন কলেজের ছাত্রী নমিতার মধ্যে পুলিশ ইনস্পেকটার সঞ্জীব খুঁজে পেয়েছিল আদর্শবোধ। কলেজ স্কোয়ারে ডাকধর্মঘটীদের দাবীর সমর্থনে সম্মিলিত শোভাযাত্রায় নমিতার অংশগ্রহণ, শুভ্র সুডৌল হাতে পতাকা ধরে নমিতার এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে সঞ্জীব বুঝতে পেরেছে রোজ সাড়ে দশটায় কাঁচ পোকার টিপ পরে যে নমিতা দীর্ঘ নিবিড় বেণী দুলিয়ে মৃদুছন্দে বেথুনের বাসেওঠে তার সাথে বিপ্লবী নমিতার কোন মিল নেই। নমিতা সত্যশরণ বাবুর মেয়ে। তিনপুরুষ ধরে জেল খাটার অভিজ্ঞতা আছে তাদের। নমিতার বড়দা আন্দামানে মারা গেছেন। সঞ্জীব মনে করেছে -" হয়তো নমিতাও তৈরি হচ্ছে জেল খাটবার জন্যে, আন্দামানের জন্যে, লাঠি আর বন্দুকের গুলির জন্যে।" [৬৯] কিন্তু সত্যশরণবাবুর বাড়িতে যেদিন নমিতা ও তার বাবা সত্যশরণ বাবুর অস্বাভাবিক বিনয়ীমূর্তি দেখল সঞ্জীব সেদিনই সে বুঝতে পেরেছে তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের আদর্শ নেই। নইলে সত্যশরণবাবু সঞ্জীবকে বলতে পারতেন না -" এখন তো আপনারাই ভরসা, যদি মুসলমানেরা অ্যাটাক - ট্যাটাক করে —— " [৭০]

---

৬৯. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী -৫ (গল্প, অপঘাত), ১ম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি -৭৩, পৃষ্ঠা -৫০

৭০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : রচনাবলী-৫(গল্প অপঘাত), ১ম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি -৭৩, পৃষ্ঠা - ৫২

'পাইপ' গল্পটি আদর্শাত্মক। পদার্থবিদ্যার অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক পি. কে. চৌধুরী পঁচিশ বছর ধরে অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের চর্চা করে বুঝতে পেরেছেন - পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য আগুন। তাঁর মতে স্বাধীনতার জন্যে মুক্তি-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসে না, এজন্য প্রয়োজন দেশজুড়ে আগুন জ্বালানোর। সে আগুন জ্বলে উঠবে বার্ণারে, ফার্নেসে, চাইনামোয়। ভারতকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন কলকারখানা আর ফ্যাক্টরীর। ধান, পাট আর প্রামোন্নয়ণ করে দেশের কল্যাণ নেই। লোহা আর আগুনেই প্রগতি ও স্বাধীনতা সম্ভব। কিন্তু যে মানুষটি পৃথিবীর মুক্তি খুঁজে যারা পৃথিবী জুড়ে আগুন জ্বালানোর স্বপ্ন দেখলেন, ঘুমোবার সময় পাইপের আগুন মশারীতে লেগে তাঁরই মৃত্যু হয়েছিল। আদর্শাত্মক গল্প হিসাবে এ গল্প সত্যিই নতুন ধরণের।

'নতুন গান' গল্পে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে বাংলাদেশের আন্দোলন, পথে পথে মিছিল, পুলিশের গুলি বর্ষণে সারাদেশে প্রচণ্ড উত্তেজনা। কিন্তু এরই মধ্যে রায় মশায়ের নৌকোয় যাত্রীরা ওঠে। এর আগে রায় মশাই গাইতেন উর্দু গজল। কিন্তু কলেজের ছাত্রদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনিও বাংলা গান ধরেছিলেন। দারোগা এসে বাধা দিয়েছিল এ গান গাইতে, কিন্তু দারোগার বাধা অগ্রাহ্য করে যাত্রীদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয় বাংলা গান। সেই গানের সুরে খালের জল, ধান ক্ষেত ও রাত্রির আকাশ অবিচ্ছিন্ন ঐক্যতান তোলে। বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিতেই গয়নার নৌকোতেও যাত্রীরা ধরেছেন সেদিন বাংলা গান। ১৯৫২ সালে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা এই গল্পটি রাজনৈতিক ও আদর্শাত্মক গল্প হিসাবে সার্থক বলা চলে।

'ভাটিয়ালী' গল্পে মায়ের বিপ্লবী সন্তান অশোক বহুদিন পরে ফিরেছিল। মায়ের সাধপূর্ণ করতে সে বাড়িতেই থাকবে, শশীঠাকুরের মেয়ে সুধাকে করবে বিয়ে। কিন্তু বিপ্লবীর আবার সংসার কিসের। স্নেহ মমতার বন্ধন ছিন্ন করে অশোক একদিন বিপ্লবী কাজে ঘরছাড়া হয়েছিল, বাড়ি ফিরেও

পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে তাকে আবার হতে হল ঘরছাড়া ।

'বনজ্যোৎস্না' গল্পটির আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা । বিপ্লবী যতীনের জীবনে ভুটানী বালিকা পিটকুমারীর আবির্ভাব রোমান্টিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করলেও অরবিন্দ এসে পথভ্রষ্ট যতীনকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় । মানবীয় প্রেমের চেয়ে দেশপ্রেমই এ গল্পে বড় হয়ে উঠেছে । তাই বনবালিকার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয়নি , বিপ্লবের আদর্শই বড় হয়েছে ।

'রেকর্ড' গল্পে বৈঠকখানা মার্কেটের চোরাই বাজার থেকে সংগৃহীত রেকর্ডের গানের ভাষা , সুর , বাজনারহস্য সম্বন্ধে আবিষ্কার করা যায়নি , কিন্তু ভদ্রলোকের কথায় বোঝা যায় — ওতে ন্যাৎসী অধিকারের সময় মুক্তি যোদ্ধাদের গান ছিল । এই রেকর্ডের প্রত্যেক শিল্পীকেই হিটলারের লোকেরা নিশ্চিহ্ন করেছিল । বুখেনভাল্ডের বর্বর শাসন , নাগা পাহাড়ের ঢাক , জোনাকির নাকাড়া , বালিঘাটের রাত্রি কাঁপানো টিকারার আওয়াজ — পার্কাস স্কোয়ার থেকে ভেসে আসা বাঘের ডাক আর কলকাতার রাজপথে পুলিশের মার খাওয়া মিছিল — সব মিলে রেকর্ডের সেই সুর সৃষ্টি করেছে । ন্যাৎসী জার্মানী অধিকারের সময়ে মুক্তি যোদ্ধাদের রেকর্ডের গানের সুর আগস্ট আন্দোলনের দিনে আমাদের দেশেও ছিল সত্য , কারণ দেশে দেশে কালে কালে এ সুর এক ও অভিন্ন । রাজনৈতিক ও আদর্শাত্মক গল্প হিসাবে এ গল্পের তুলনা নেই ।

* * *

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাসির গল্প :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোট গল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর ছোটদের জন্য রচিত হাসির গল্পের আলোচনা না করলে তাঁর গল্পের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই কারণে তাঁর কিশোর গল্পগুলির মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প আলোচনা করে। এ ধরণের গল্প রচনায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় তুলে ধরা গেল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে একটি চিরসবুজ, হাস্যমুখর সদা প্রসন্ন কিশোর মন আত্মগোপন করেছিল। সেইটি তাঁকে ছোটদের জন্য গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্র কিশোর, সুকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ লেখক কিশোর গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যের কিশোর গল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁরা লেখকরূপে উপন্যাস, ছোটগল্প রচনার পাশাপাশি এই কিশোর গল্পগুলি লিখেছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু বড়দের রচনায় যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের অনেক পরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটদের জন্য গল্প রচনায় হাত দেন। এ প্রসঙ্গে বিমল মুখোপাধ্যায় বলেছেন - 'ছোটদের রচনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শুরু করেছেন বড়দের রচনার অনেক পরে। যতদূর মনে পড়ে ১৩৫৭ সালে 'মৌচাক' মাসিক পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় এবং বলতে দ্বিধা নেই এর জন্য উদ্যোগী ছিলুম আমি নিজেই। তখন বড়দের সাহিত্যে তাঁর বেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, বইও প্রকাশিত হয়েছে কয়েকখানি, কিন্তু ছোটদের সাহিত্যে তখনও তিনি হাত দেন নি। তাই আমি যখন তাঁকে লিখতে অনুরোধ করেছিলুম, তখন দারুণ সংকোচে ও দ্বিধায় দোদুল্যমান ছিল তাঁর মন। কিন্তু আমার ধারণা ছিল অন্যরকম। আমি জানতুম, তিনি যদি একবার ছোটদের লেখায় হাত দেন, তা হলে অচিরাৎ সাহিত্যের এই বিভাগটিতেও তিনি সমাদরে উচ্চ আসন দখল করে নিতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিয়েছিলেনও তাই।'[৭১]

ছোটদের জন্য লেখা গল্পগুলিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরিবেশন করেছিলেন অনাস্বাদিত হাস্যরস। ছোটরা প্রাণভরে তাঁর গল্পগুলি পড়ত আর হাসি

৭১। বিমল মুখোপাধ্যায় : ছোটদের সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কালি ও কলম, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭, পৃষ্ঠা - ৫৬৩

খুশিতে উচ্ছলিত হয়ে উঠত ওদের মন। বাংলা সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্বে এমনভাবে হাসাতে পেরেছিলেন খুব কম লেখকই। তাঁর গল্প কাতুকুতু দিয়ে হাসাতে হয় না, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হাসির উদ্রেক ঘটায় তাঁর গল্প। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র শিবরাম চক্রবর্তী ছাড়া আর অন্য কেউ ছোটদের জন্যে এমন সুন্দর হাসির গল্প উপহার দিতে পারেন নি। তাঁর হাসির গল্পগুলি পড়ে মার্ক টোয়েন ও জেরোম কে জেরোমের হাস্যরসাত্মক গল্পের কথা মনে পড়ে। বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘনাদার গল্প লিখে ছোটদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, ঘনাদার আশ্চর্য গল্পগুলির প্রভাব নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর গল্পে পড়েছে। ঘনাদার সাথে টেনিদার নামের দিক থেকেও কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। বিশু মুখোপাধ্যায় বলেছেন - 'ছোটদের সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রর যেমন অবিস্মরণীয় চরিত্র ঘনাদা, বিমল দত্তর যেমন পিলেখুড়ো তেমনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি এক নম্বরের মার্কামারা চরিত্র পটলডাঙার টেনিদা। স্কুলের ছাত্র কিন্তু হলে কি হবে, বয়সের গাছপাথর নেই, দীর্ঘকাল ধরে নটনড়ন-চড়ন, বেশ করে বসে আছে স্কুলে। খুব গপ্পির রাজা, বাকপটুতায় ওস্তাদ, মতিস্থিরতার বালাই নেই, মজার মজার কথা বলেন।' [৭২]

এই হাসির গল্পগুলিতে প্রধান চরিত্র হিসাবে টেনিদা, প্যালারাম, হাবুল, ক্যাবলা প্রভৃতি চরিত্রকে স্থান দিয়েছেন। স্থান করে দিয়েছেন ঘন্টাদা, কাবলু কাকা, কুট্টি মামা (গজগোবিন্দ হালদার), মাকুদা প্রভৃতি অদ্ভুত সব চরিত্রকে। এই চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে হালকা ঠাট্টা, ইয়ার্কি, ফাজলামি, চ্যাংড়ামি প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু হিউমারের স্পর্শে সব চরিত্রেরই কার্যকলাপগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। টেনিদাও কোন অংশে কম নন। তেলেভাজা, চীনে বাদাম, আইসক্রীম, কাটলেট, ডালমুট, পকৌড়ি, কাজুবাদাম, রসগোল্লা, রাজভোগ এসব না খেলে তার মুখ থেকে গল্প বের হতে চায়না। অপূর্ব অদ্ভুতভাবে এই টেনিদার আজগুবি গল্পবলার ভঙ্গির জন্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাসির গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। তিনি ছোটদের

৭২। বিশু মুখোপাধ্যায় : ছোটদের সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : কালি ও কলম, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৭, পৃষ্ঠা-৫৬৫

জন্য লেখা গল্পগুলি প্রথমে পৃথক পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যুর পর পত্নী আশাদেবী এই গল্পগুলির কয়েকটি পৃথক ভাবে প্রকাশ করেছেন, আবার সমস্ত কিশোর গল্পগুলিকে সংকলিত করে ৪টি খণ্ডে সমগ্র কিশোর সাহিত্য নামে প্রকাশ করেছেন। নিম্নে গল্প গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল।

সপ্তকান্ড - ১৩৪১
ছুটির আকাশ - ১৩৫৬
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প - ১৩৫৭
খুশির হাওয়া - ১৩৫৮
হাসির গল্প - ১৩৬১
ঝাউবাংলোর রহস্য - ১৩৬৪
ছোটদের ভালো ভালো গল্প - ১৩৬৪
হনোলুলুর মাকুদা - ১৩৬৫
টেনিদার গল্প - ১৩৬৮
ঘন্টাদার কাবলু কাকা - ১৩৭২
টেনিদা ও ভুতুড়ে কাণ্ড - ১৩৮১
সমগ্র কিশোর সাহিত্য ১ম (জানুয়ারী, ১৯৭৮), ২য় (মার্চ ১৯৮১),
৩য় (সেপ্টেম্বর ১৯৮৩), ৪র্থ (এপ্রিল, ১৯৮৭)

এই গল্পগ্রন্থগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য গল্প আলোচনা করা গেল।
'কুট্টিমামার হাতের কাজ' গল্পে টেনিদা বলেছেন যে চিড়িয়াখানার কালো ভালুকের নাকের একদিক থেকে খানিকটা রোঁয়া নাকি কুট্টিমামার জন্যই উঠে গিয়েছিল। এই কুট্টি মামাই গজগোবিন্দ হালদার। আস্ত একটা পাঁঠা তিনি খেয়ে নিতে পারেন, তিন মিনিটে তিনসের রসগোল্লা খেয়ে নেন। এহেন কুট্টিমামা শিলিগুড়ি স্টেশনের রেস্তোরাঁয় বসে দশপ্লেট মটন কারি আর সের তিনেক চালের ভাত খেয়ে যখন আরো দু প্লেট চেয়েছেন তখন এক মেম সাহেব সেই দৃশ্য দেখে গোঁ গোঁ শব্দে ধপাৎ করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। এই ঘটনায় খুশি হয়ে সাহেব তাঁর

কোম্পানীতে কুট্টিমামার কাজ দিলেন। মংপু চা বাগানে কুট্টিমামা ঢুকে গেলেন চাকরীতে। বাগানের কুলি-কামিন খাটাবার জন্য তাঁকে প্রায়ই দার্জিলিং যেতে হত। একদিন দার্জিলিং থেকে বাজার নিয়ে ফেরার পথে চাকর রাম ভরসাকে না পেয়ে কুট্টিমামা নিজেই শুঁটকি মাছের বস্তা নিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। এবং বিলম্বিত রামভরসাকে দেখে গালমন্দ করে তারই পিঠে শুঁটকির বস্তা চাপিয়ে দেন। গোটা রাস্তা ধরে রামভরসা থপ থপ শব্দে এগিয়ে গেছে। কুট্টি শুনতে পেয়েছেন তার চলার ঠিক ঠিক কচর মচর শব্দ। কুট্টিমামা যখন কল্কে ধরিয়ে, তামাক খেতে পাথরের ওপর বসে পড়েন তখন রাম ভরসাও একটু দূরে ওত পেতে বসে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুঁটকি মাছ চিবানোর আওয়াজ টের পেয়ে কুট্টিমামা যেই হুঁকোটাকে নিয়ে তার দিকে তেড়ে যান অমনি চাঁদের আলোয় কুট্টিমামা দেখতে পেলেন সেটা রামভরসা নয়, একটা ভালুক। এই দেখে কুট্টিমামা আগুনসুদ্ধ হুঁকোটা তার নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আফিং এর নেশায় ভালুককে রাম ভরসা ভেবে কুট্টিমামা নিজের ঘাড় মটকাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভালুক বলে চিনতে পারেন নি, ভালুকের পায়ের কালো রোঁয়াকে রাম ভরসার কম্বল মনে করেছিলেন কুট্টিমামা।

'একটি ফুটবল ম্যাচ' নামক গল্পে ভালো ফুটবল খেলা না জেনেও থাণ্ডার ক্লাবের প্যালারাম কিভাবে ক্যাপ্টেন টেনিদার কথায় ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে ফুটবল খেলায় নেমে শেষ মুহূর্তে যে একটি গোল করে খেলায় জিতেছে, সকলের প্রশংসাও কুড়িয়েছে – তারই হাস্যকর কাহিনী গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। এ খেলায় প্যালারামের খেলার চোটে ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের ন্যাড়া মিত্তির, টাম্বা সিঙ্গি সব কাৎ। কিন্তু সারা খেলা ভয়ে ভয়ে থেকে কোন রকমে শেষ মুহূর্তে একটি গোল করে প্যালারাম সবাইকে হতভম্ব করে দেয়।

পঞ্চবার টেনিদার 'ঢাউস' ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে যে কী বিপর্যয় ঘটেছিল তারই বর্ণনা আছে 'ঢাউস' গল্পে। টেনিদা ডি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস ইয়াক

হয়াৎ বলতে বলতে গড়ের মাঠে ঘুড়ি ওড়ায়। সঙ্গে ছিল হাবুল, প্যালারাম আর ক্যাবলা। বটগাছে উঠে ঘুড়িটা উড়িয়ে দেবার আগে ক্যাবলা টেনিদাকে বলেছিল দড়িটা খোল খোঁটে বেঁধে রাখতে। কিন্তু বীরত্ব দেখিয়ে টেনিদা ক্যাবলার ওস্তাদি মানেন নি। তারপর এক আশ্চর্য ব্যাপার। গোঁ গোঁ ডাক ছেড়ে সেই পেল্লায় ঢাউস ঘুড়িটো আকাশে উড়ল, সঙ্গে টেনিদাকেও উড়তে হল। টেনিদা লাটাই ধরে চিঁলা প্রাণ্ড করে চেঁচাতে থাকলেও সেই ঘুড়ি টেনিদাকে নিয়ে ক্রমাগত ওপরে উঠতে উঠতে পশ্চিম দিকে যেতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত পাঁচিশ হাত উপর দিয়ে উড়তে উড়তে ঘুড়িটা গোত্তা খেয়ে সোজা পড়িয়ে নেমে পড়ে। আর টেনিদা গিয়ে আটকে পড়েন আউটরাম ঘাটের বড় গাছের মগডালে। সেখানে তাঁকে কাকে ঠোকরাচ্ছিল।

'ভুতুড়ে কামরা' গল্পে জংশন স্টেশনে একটা কামরা খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্যে ট্রেন থেকে সেটিকে কেটে নিয়ে শেডে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বল্টুদা তা টের পায়নি, বরং যাত্রীরা নেমে গেছে দেখে একা একা কামরায় যেতে পারবে বলে আনন্দিত হয়েছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে সেই কামরাকে তার কাছে ভুতুড়ে কামরা মনে হল। শুধু তাই নয়, অন্ধকারের সুযোগ বুঝে একটা লোম ওঠানা কুকুর তার বিছানায় উঠে আসে। গাড়ি ধোওয়া জল এসে পড়ে তার চোখে মুখে। আর সেই অন্ধকারে এক ইনস্পেকটার সাহেবকে দেখে তার মনে হল, সাক্ষাৎ ভূত। এই সব দেখে ভয়ে বল্টুদার দাঁত কপাটি লেগে গিয়েছিল। আসলে বল্টুদার ভুলের জন্যই এমন হয়েছে, গল্পটি আদৌ ভৌতিক নয়।

'জবরহরি ফিল্ম কর্পোরেশন' গল্পে টেনিদার প্ল্যান অনুযায়ী প্যালারাম আর টেনিদা দুজনে মিলে ফিল্ম কর্পোরেশন খোলার নাম করে অভিনয়ের লোভ দেখিয়ে কোম্পানীর শেয়ার কিনতে বিজ্ঞাপন দেয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সেই বিজ্ঞাপনের সাক্ষাৎ ফল ফলে। স্কুলের ছেলে, মোড়ের বিড়িওয়ালা, পাড়ার ঝিকে

ঝি, উড়ে ঠাকুর ও ভীষণ দর্শন ওয়ালা কাবুলিওয়ালা সব অভিনয়ের লোভে এসে ভিড় করে। তাদের কাছ থেকে এই ভাবে ছাব্বিশ টাকা বকেয়া আদায় পেয়ে টেনিদা তো খুশিতে ডগমগ। দ্বারিক ঘোষের রাজভোগ, চাচার কাটলেট আর কে.সি. দাসের রসমালাই খেয়ে টেনিদা আর প্যালারাম দুজনেই শরীরটা সারিয়ে নিয়ে যখন আরেক নতুন প্ল্যান করছিল তখন যমদূতের মতো কাবুলিওয়ালা ক্ষিপ্ত হয়ে এসে তাদের আক্রমণ করার উপক্রম করছে, শুধু তাই নয় ঠিকে ঝি, উড়ে ঠাকুর, শ্যামবাজারের ছেলেরা সবাই এসে টেনিদাকে শাসাতে থাকে। কিন্তু টেনিদা সুযোগ বুঝে প্যালারামকে কাঁধে নিয়ে ছুটে আসে সোজা হাওড়া স্টেশনে। দেওঘরের টিকিট কেটে দিল্লী এক্সপ্রেসে উঠবে তারা দুজনেই।

'ঘন্টাদার কাবুল কাকা' গল্পে বিশ্বখাদক কাবুল কাকা ঘন্টাদার কাছে আতঙ্ক। অথচ কাবুল কাকা ঘন্টাদার বাড়িতে এসে মাছ, মাংস, ঘি সব সাবাড় করে দিচ্ছেন। এই দেখে ঘন্টাদার চিন্তার শেষ নেই। শ' খানেক লুচি পায়েস তিনি খেয়ে শেষ করেন। আস্ত পাঁঠা পর্যন্ত খেয়ে নিতে পারেন। এহেন কাবুল কাকাকে বিষয়সম্পত্তির লোভে ঘন্টাদা কৃত্রিম যত্ন করলেও মনে মনে কিন্তু তাঁর বিদায় চান। সেই জন্যই তাঁর বিছানায় ছারপোকা ছেড়ে দিয়ে তাঁর পালাবার পথ করে দেন। পরদিন সকালে কাবুলকাকার ঘুম ভাঙতে দেরী দেখে ঘন্টাদা ভেবেছেন, কাবুল কাকা মরে গেছেন। কিন্তু তা হয় নি। বরং ছারপোকারা কাবুল কাকার গা চুলকে দিয়েছে বলেই নাকি তাঁর ভালো ঘুম হয়েছে। তাই কাবুল কাকা এমন আরাম শয্যা আর ভালো খাবার পেয়ে তিন দিনের পরিবর্তে ঘন্টাদার বাড়িতে মাস খানেক থাকার কথা ঘোষণা করলেন। এ কথা শুনে ঘন্টা দা মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

'ঘোড়া মামার অবদান' গল্পে ঘোড়ামামা কি ভাবে প্যালারামকে রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা, সন্দেশ, নানার জিনিস খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে পটলডাঙা থেকে এসপ্ল্যানেড অবধি রাস্তা থেকে দেশলাইয়ের খাপ, ভাঙা টিনের

বাক্স, ফেলে দেওয়া টুথ ব্রাশ, পেরেক এ সব কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কৌশলে তাকে খাওয়ানোর পরিবর্তে ঝুলি থেকে পথে কুড়িয়ে নেওয়া পায়ে দড়ি বাঁধা একটা ইঁদুর বের করে দেন। কারণ এই ইঁদুর ভাঁড়ারে ছেড়ে দিলে অনেক বাচ্চা হবে, উৎপাত করবে এবং তখন তার বাবা বেড়াল আনবেন। বেড়ালকে দুধ খাওয়াতে কিনবেন গোরু, সেই গোরুর দুধেই হবে সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, ছানার জিলিপি, ঘিয়ের পেঁড়া ও পিঠে হবে তা থেকে।

'হালখাতার খাওয়া দাওয়া' গল্পে হালখাতার দিনে মিষ্টিমুখ করার লোভের কারণে প্যালারাম আর টেনিদা কি ভাবে প্রচণ্ড শাস্তি পেয়েছিলেন, সেই চিত্রই কৌতুককর পরিবেশের মধ্য দিয়ে লেখক তুলে ধরেছেন। কুট্টিমামা অর্থাৎ গজগোবিন্দ হালদারের হালখাতার নিমন্ত্রণের কয়েকটি চিঠি হাতসাফাই করে টেনিদা প্যালারামকে নিয়ে এ দোকান ও দোকান ঘোরাঘুরি করে টাকা ছাড়াই মিষ্টি খেয়ে শেষ পর্যন্ত নাজিরাবেগের নস্যি কোম্পানীতে এসে গজগোবিন্দ হালদারের নাম করে বিরিয়ানি, পোলাও, মোগলাই, কালিয়া খেতে গিয়ে আচ্ছা শাস্তি পেয়েছিলেন। গজগোবিন্দ হালদার নস্যি কিনে তিনশো ছেষট্টি টাকা বাকী করেছেন, সেই রাগেই কোম্পানী তাদের অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শেকল এঁটে দেন। তারপর বাছা বাছা গুণ্ডা দিয়ে দেবে রামঠ্যাঙানি। এই বেকায়দায় পড়ে টেনিদা ও প্যালারামের অবস্থা যখন সাংঘাতিক বিপদের মুখোমুখি তখন সেই ঘরের জানলা দিয়ে দুজনেই ডাস্টবিনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পচা নোংরা মাখানো শরীর নিয়ে কুকুরের তাড়া খেয়ে সোজা বড় রাস্তার দিকে ছুটে আসে। সেখান থেকে গঙ্গায় গিয়ে দুঘন্টা স্নান করলেন তবেই তাদের গায়ের গন্ধ দূর হবে।

'বনভোজনের ব্যাপার' গল্পে প্যালারাম, ক্যাবলা, হাবুল আর টেনিদার বনভোজনের আয়োজন কি করে পণ্ড হয়ে যায় তারই হাস্যকর বর্ণনা আছে। খিচুড়ি, আলুভাজা, পোনামাছের কালিয়া, রসগোল্লা আর রাজহাঁসের ডিম দিয়ে হবে খাসা বনভোজন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজহাঁসের ডিমের পরিবর্তে মাদ্রাজী ডিম, একরাশ হাঁড়ি কলসি, চালের পুঁটলি, তেলের ভাঁড়, রসগোল্লা, লেডিকেনি নিয়ে

মার্টিনের রেলে করে স্টেশন পর্যন্ত এসে সেখান থেকে কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তা ধরে যেতে যেতে আছাড় খেয়ে রসগোল্লা, লেডিকেনি, ডিম আচার কাদামাটিতে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়, বনভোজনের অবশিষ্ট সামগ্রীও একদল বানর নিয়ে কাঁঠাল গাছে উঠে বসে থাকে। বনভোজন এইভাবে পণ্ড হয়ে গেলে টেনিদা পাকা জলপাইয়ের সন্ধান পেয়ে ফল ভোজনের জন্যে বাগানের দিকে ছুটে যায়।

'আর্ট বাই কার' গল্পে এক ভদ্রলোক প্যালারাম, নেড়া, গজা, ভজা, আর ন্যাদা নামে পাঁচ বন্ধুকে চাইবাসা যাওয়ার নাম করে কৌশলে তাঁর কালো গাবদা চেহারার ঝরঝরে পুরনো মোটরগাড়িতে তুলে নদী পেরিয়ে উঁচু ডাঙাটি ওদের দিয়ে ঠেলিয়ে নিয়ে গাড়ি পার করে চাইবাসার পরিবর্তে ট্যাকথালি যাবেন বলে ওদের কাছ থেকে বিদায় নেন। আসলে ভদ্রলোক গাড়ি ঠেলবার জন্যেই ওদের কে গাড়িতে তুলে এনেছিলেন, গাড়িতে করে চাইবাসা পৌঁছে দেবার জন্যে নয়।